দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

রাজ্যের রাজধানীর
পুলিশ কমিশনারকে
সরিয়ে দেওয়া
ভারতীয় নির্বাচনের
ইতিহাসে নজিরবিহীন

.... পৃঃ ১৪

দুর্নীতিতে
কমিউনিস্টরাও
কম যায় না

.... পৃঃ ১৭

৬৮ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা ।। ২৫ এপ্রিল ২০১৬ ।। ১২ বৈশাখ - ১৪২৩ ।। যুগাব্দ ৫১১৮ ।। website : www.eswastika.com ।।

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ৩২ সংখ্যা, ১২ বৈশাখ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

২৫ এপ্রিল - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

তৃণমূলকে ভোট দিলে আপনাকেও চোর-ডাকাতদের খাতায় নাম লেখাতে হবে ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

স্বয়ং নারদ এলেও দিদিকে হারাতে পারবে না ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

কংগ্রেস-কমিউনিস্ট আঁতাত ▯ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ▯ ১১

রাজ্যের রাজধানীর পুলিশ কমিশনারকে সরিয়ে দেওয়া ভারতীয় নির্বাচনের ইতিহাসে নজিরবিহীন ▯ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ১৪

দুর্নীতিতে কমিউনিস্টরাও কম যায় না ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ১৭

বাংলা নববর্ষ হিন্দুদের, আকবরি নয়, ▯ মৃণাল হোড় ▯ ২১

বৈদিক রমণী ▯ অমিত ঘোষদস্তিদার ▯ ২৩

বিজেপির অসম বিজয় একান্ত জরুরি ▯ সুবীর ভৌমিক ▯ ২৭

ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ : তত্ত্বকথার আড়ালে লালবাবারা আমাদের মা-কে গালি দিচ্ছে ▯ প্রবাল চক্রবর্তী ▯ ২৯

জাতীয়তাবোধ এবং তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা ▯ সঞ্জীব বাগচী ▯ ৩২

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯ **অন্যরকম : ৩৩** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ৩৫** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৮**▯ **শব্দরূপ : ৪০** ▯ **চিত্রকথা : ৪১** ▯ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

স্বস্তিকা

জাতীয়তা ও রবীন্দ্রনাথ

স্বাধীনতার এত বছর পরেও আমাদের জাতীয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যে দ্বিজাতি তত্ত্বের কারণে দেশ ভাগ, সেই সমস্যাটাই আবার নতুন করে উঠে আসছে। এই সমস্যার বিষয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কী ভাবতেন, ২৫ বৈশাখ তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে সেটাই এবার বিশেষ বিষয়।

পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের শিল্প চেতনা নিয়ে আলোচনা করেছেন পর্ণা মুখার্জী।

দাম একই থাকছে ১০্ টাকা।।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

অশান্ত কাশ্মীর

দেশের পাঁচটি রাজ্যে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া মোটামুটি শান্তিতে যখন বিধানসভা নির্বাচন চলিতেছে, তখন দেশের আর একটি অঙ্গ রাজ্য জম্মু-কাশ্মীরে একটির পর একটি অশান্তির ঘটনা ঘটিয়া চলিতেছে। ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি (এন আই টি)-তে ভিন্ন রাজ্যের ছাত্রদের উপর পুলিশি নির্যাতনে পর যে উত্তেজনা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা শান্ত হইবার আগেই উপত্যকা আবার অশান্ত হইয়া উঠিল। কাশ্মীর উপত্যকার বিভিন্ন এলাকায় সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী (বিএসএফ)-র বিরুদ্ধে যেভাবে তীব্র হিংসাত্মক বিরোধিতা ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহাতে রাজ্য সরকারের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্র সরকারও উদ্বেগ বোধ করিতেছে। হান্দওয়াড়া বাজারে এক নাবালিকাকে সেনা শ্লীলতাহানি করিয়াছে—এই গুজবটি ছড়াইবার পরই ক্ষুব্ধ জনতা জড়ো হইয়া এলাকার সেনা চৌকি পুড়াইয়া দেয়। কুপওয়াড়া ও হান্দওয়াড়াতে সংঘর্ষে ইতিমধ্যে পাঁচজনের মৃত্যু হইয়াছে। নূতন করিয়া প্রতিবাদ শুরু হওয়ায় ওইসব এলাকায় আবার নিষেধাজ্ঞা জারি হইয়াছে। জম্মু-কাশ্মীরে মাঝে মধ্যেই যে এই ধরনের অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হইতেছে তাহা বিক্ষিপ্ত ঘটনা বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। এই সীমান্ত রাজ্যে কখনও পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীরা, কখনও রাজ্যের অভ্যন্তরেই সক্রিয় সন্ত্রাসবাদীরা, কখনও আবার সামান্য ঘটনার উপর রঙ চাপাইয়া উত্তেজনার পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হইতেছে—ঠিক যেমন এই ক্ষেত্রে হইয়াছে। হান্দাওয়াড়া-তে প্রকৃত কী ঘটিয়াছিল তাহা সঠিকভাবে বলা এখন কঠিন। কেননা, ওই নাবালিকার বয়ান অনুযায়ী তাহার শ্লীলতাহানির জন্য স্থানীয় এক যুবকই দোষী। অন্যদিকে তাহার মা'র বক্তব্য, জোরজবরদস্তি করিয়া মেয়ের বয়ান লিখাইয়া লওয়া হইয়াছে। সত্য যাহাই হউক না কেন, সীমান্তরক্ষী বাহিনীর বিরুদ্ধে রাস্তায় নামিয়া হিংসাত্মক ঘটনার মাধ্যমে প্রতিবাদ জানানোকে কোনো ভাবেই সমর্থন করা যায় না।

প্রতিবাদের নামে জনতা সুরক্ষা বাহিনীর ছাউনির উপর হামলা করিবে কিংবা তাহাদের হাতিয়ার কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিবে—ইহার কোনো অর্থ হয় না। আত্মরক্ষার জন্য না চাহিলেও সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে কখনও কখনও গুলি চালাইতে হয়। এই গুলি চালনার ফলে কখনও কেহ নিহত হইলে তাহার রাজনৈতিক লাভ উঠাইবার জন্য উগ্রবাদীরা তো সবরকম চেষ্টা করিয়াই থাকে, এমনকী মুখ্যধারার রাজনৈতিক দলগুলিও এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। কাশ্মীরে এখন ইহাই ঘটিতেছে। এখনও একমাসও হয় নাই মেহবুবা মুফতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। এরই মধ্যে এই ঘটনা তাঁহার সরকারের পক্ষে উদ্বেগজনক। রাজ্যের সমস্যার জন্য সেনা দায়ী নয়—এই বিশ্বাসে যদি তিনি স্থির থাকেন, তবে তাহা বেশি ভালো হইবে। জম্মু-কাশ্মীরে বিশেষ আইন বলে যে সেনা রহিয়াছে তাহার কারণ সেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদী, পাকিস্তানপন্থী এবং সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থকরাও বহাল তবিয়তে রহিয়াছে। যতদিন পর্যন্ত কাশ্মীরের জনতা ও রাজনৈতিকদলগুলি এই দেশবিরোধী শক্তিগুলির প্রতি নরম মনোভাব পোষণ করিবে, ততদিন জম্মু-কাশ্মীরে অশান্তির আবহাওয়া বজায় থাকিবে। এবারই প্রথম নয় যে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর বিরুদ্ধে হিংসাত্মক প্রতিবাদ জানানো হইতেছে। এইসব প্রতিবাদের যে জোরাল কোনো ভিত্তি আছে এমনও নহে। অথচ উপত্যকায় এরকম প্রতিবাদ স্বাভাবিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যখন রক্ষী বাহিনীর বিরুদ্ধে রাস্তায় নামিয়া পাথর ছোড়া হয় তখন সন্ত্রাসবাদীদের ঝাণ্ডাও উড়িতে দেখা যায়। এরই মাঝে রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে বনধ্ ও অবরোধও চলিতে থাকে। একই সঙ্গে অভিযোগ করা হয় যে ভারত সরকার কাশ্মীরকে উপেক্ষা করিতেছে। কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ ও সেইসঙ্গে স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলিকে বুঝিতে হইবে অশান্তির আবহাওয়া থাকিলে সমস্যার সমাধানও যেমন হইবে না, তেমনই রাজ্যের উন্নয়নও সুদূরপরাহত হইবে।

সুভাষিতম্

চলচ্চিত্তং চলদ্‌বিত্তম্ চলজ্জীবনযৌবনং।
চলাচলমিদং সর্বং কীর্তি যস্য স জীবতি।।

মন, সম্পত্তি, জীবন ও যৌবন-সহ এই পৃথিবীর সবই চলাচল করতে থাকে। কেবল যাঁর কীর্তি আছে তিনিই জীবিত থাকেন।

সংবাদ প্রতিবেদন

কালনায় শিক্ষাঙ্গনে মৌলবাদী শিক্ষকের ফতোয়া

সংবাদদাতা॥ তুলসীমালা ও কপালে তিলক কেটে স্কুলে আসার জন্য ষষ্ঠ শ্রেণীর এক ছাত্রকে এক মুসলমান শিক্ষকের হাতে প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হতে হলো। গত ৩০ মার্চ বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার কৃষ্ণদেবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে এই ঘটনা ঘটেছে। রাজনৈতিক দলগুলির স্থানীয় নেতা ও প্রশাসনকে ঘটনাটি জানানো হলেও তারা বিষয়টি মীমাংসা করার কোনো উদ্যোগ নেয়নি। পরে যখন স্থানীয় মানুষ এই ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় নামে তখন পুলিশ নিরীহ হিন্দু গ্রামবাসীদের উপর নির্বিচারে লাঠি চালায় ও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। মুসলমান ভোট ব্যাঙ্কের কারণেই রাজনৈতিক দলগুলির ও শাসকদলের চাপে প্রশাসনের এরকম আচরণ বলে অভিযোগ। শেষে কালনা বিধানসভার বিজেপি প্রার্থীর হস্তক্ষেপে প্রশাসন নড়ে চড়ে বসে।

বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার কৃষ্ণদেবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে আশেপাশের হিন্দু ও মুসলমান ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে। বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র অপূর্ব হালদার গলায় তুলসীমালা ও কপালে তিলক কেটে স্কুলে যেত। এতে ওই স্কুলের শিক্ষক হাসান আলি সেখের গাত্রদাহ হতে থাকে। তিনি ছাত্রটিকে কয়েক দিন ধরে মারার ভয় দেখিয়ে কোনো ছাত্র-ছাত্রী তিলক ও মালা পরে স্কুলে আসতে পারবে না বলে ফতোয়া জারি করে দেন। ছাত্রটি এ বিষয়ে বাড়িতে জানালে তার বাবা দীপক হালদার স্কুলের প্রধান শিক্ষককে জানান। প্রধানশিক্ষক সুজিতবরণ মুখার্জী বলেন, এই রকম কোনো নিয়ম নেই যে তিলক ও মালা পরে স্কুলে আসা যাবে না। এটা ওই শিক্ষকের নিজস্ব ফতোয়া।

এরপর যা ঘটল তা বিস্ময়কর। গত ৩০ মার্চ প্রতিদিনের মতো ছাত্রটি তিলক ও মালা পরে স্কুলে আসে। শিক্ষক হাসান আলি ছাত্রটিকে দেখামাত্রই সকল ছাত্রের সামনে তার তিলক মুছে দেন এবং গলার তুলসীমালা খুলে দেন। শিক্ষক ক্লাসরুম থেকে চলে গেলে ছাত্রটি পুনরায় গলায় মালা পরে নেয়। শেষ পিরিয়ডে ওই শিক্ষক ক্লাসরুমে ঢুকে ছাত্রটিকে দেখে মারতে থাকে ও হিন্দু জাত তুলে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং ছাত্রটির গলা থেকে মালা ছিঁড়ে দেন ও গলা টিপে ধরেন।

এই ঘটনায় ছাত্রের বাবা স্কুলে এসে বিষয়টি শিক্ষকের কাছে জানতে চান। তখন সেই মৌলবাদী শিক্ষক ফতোয়া জারি করেন বলেন, স্কুলে কোনো ছাত্র-ছাত্রী কপালে তিলক, গলায় মালা, হাতে বালা পরে এলে সেই ছাত্রছাত্রীকে স্কুল থেকে বিতাড়িত করা হবে। অসহায় পিতা এই হুমকির কথা স্কুলের অন্য শিক্ষককে জানালে তাঁরা বিষয়টি এড়িয়ে যান। কোনো সুরাহার পথ না পেয়ে ছেলেকে নিয়ে কালনা থানায় অভিযোগ জানাতে যান। কিন্তু অভিযোগে মুসলমান শিক্ষকের নাম থাকায় থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার কোনো অভিযোগ না নিয়ে উল্টে ছাত্রর বাবাকে নানারকম ভয় দেখিয়ে থানা থেকে বের করে দেন। অসহায় পিতা গ্রামে ফিরে এসে ওই ঘটনা গ্রামবাসীকে জানালে পরের দিন ৩১ মার্চ গ্রামের কয়েকজন অভিভাবক স্কুলে এসে হিন্দু ধর্মের ও হিন্দু জাতির বিরুদ্ধে অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করেন। তাঁরা প্রধান শিক্ষকের কাছে দাবি জানান যে ওই শিক্ষক হিন্দু ধর্মের উপর আঘাত করে সমগ্র হিন্দু জাতিকে অপমান করেছে। তাঁরা দাবি জানান—

১। মৌলবাদী শিক্ষককে গ্রেপ্তার করতে হবে, ২। স্কুল থেকে তাঁকে বরখাস্ত করতে হবে এবং ৩। সেই শিক্ষক কোনো মৌলবাদী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত কিনা তা সি আই ডি তদন্ত করা হোক।

সেসময় কালনা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে আন্দোলন-কারীদের জোর করে হটাবার ব্যবস্থা নেন। পুলিশের এই রকম আচরণে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে কয়েক হাজার হিন্দু নারীপুরুষ নির্বিশেষে এসে আন্দোলনে যোগ দিয়ে প্রতিবাদ করতে থাকেন। ঘটনাস্থলে কালনা মহকুমা শাসক, কালনা মহকুমা এসডিপিও আসেন। কিন্তু প্রশাসন কর্তারা ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ গ্রহণ না করায় আন্দোলনকারীরা রাস্তায় নেমে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন। আর তখনই পুলিশ ও র‌্যাফ নিরীহ হিন্দু গ্রামবাসীর উপর নির্বিচারে লাঠি চালায়। প্রায় শতাধিক গ্রামবাসী আহত হয়। কারো মাথা ফেটে যায়, পা-হাত ভেঙে যায়। পুলিশ গ্রামের ভিতর ঢুকে নিরীহ গ্রামবাসীদের বেদম প্রহার করে এবং ৯ জনকে কালনা থানায় লকআপে ঢুকিয়ে দেয়। প্রশাসন কর্তারা ওই নিরাপরাধ ব্যক্তিদের নামে সাম্প্রদায়িক কেস করার পরিকল্পনা করেন। অথচ আন্দোলন সংঘঠিত হয়েছিল মুসলমান শিক্ষকের অন্যায় ও হিন্দু ধর্মের অপমানের বিরুদ্ধে। তাতে কোনো রাজনৈতিক দল বা নেতারা অংশগ্রহণ করেননি। গ্রামবাসী পুলিশি অত্যাচারের ভয়ে সিপিএম, কংগ্রেস, টিএমসি, বিজেপি নেতাদের কাছে ছুটে যান সাহায্যের জন্য। বিজেপি ছাড়া কেউ এগিয়ে আসেনি, কারণ মুসলমান শিক্ষকের বিরুদ্ধে তারা নাকি কিছু করতে পারবেন না।

অভিযোগ, এর পিছনে শাসক দলের পরোক্ষ হাত রয়েছে। আসন্ন বিধানসভা ভোটে মুসলমান ভোট পাবার জন্য এবং টি এম সি নেতাদের অঙ্গুলি হেলনে প্রশাসন কর্তারা মুসলমান শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। বিজেপি নেতাদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপে কালনা থানার ভার প্রাপ্ত অফিসার আটক নিরীহ গ্রামবাসীদের মুক্তি দেয় এবং অভিযুক্ত মৌলবাদী মুসলান শিক্ষককে গ্রেপ্তার করার এবং আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম এবং পত্র-পত্রিকার সাংবাদিকরা ঘটনাস্থলে আসেন এবং তারা সত্য ঘটনা প্রকাশ না করে নিজেদের মনগড়া খবর পরিবেশন করেন বলে স্থানীয় মানুষদের অভিযোগ।

মৌলবাদী সংগঠনগুলি শাসকদলের প্রত্যক্ষ মদতে যেভাবে গজিয়ে উঠেছে তা সমূলে প্রতিহত না করতে পারলে পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হতে আর বেশি সময় লাগবে না বলে এলাকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন।

যুদ্ধের উপকরণ বিনিময় চুক্তির পথে ভারত-আমেরিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১২ এপ্রিল ভারত-আমেরিকা 'নীতিগত ভাবে' রাজি হয়েছে দু'দেশের মধ্যে যুদ্ধের উপকরণ বিনিময়ের ক্ষেত্রে। এর ফলে দু'টি দেশই তাদের বিমান ঘাঁটি এবং নৌ ঘাঁটিকে অনুমতি দিল জ্বালানি, জল ও খাদ্যের পারস্পরিক জোগান অব্যাহত রাখার ব্যাপারে। দরকারি এই জোগান 'শোধ দেওয়ার ভিত্তি'তে ভারত- আমেরিকা যুদ্ধজাহাজ ও যুদ্ধবিমানের ক্ষেত্রে এই নীতি কার্যকর করতে চলেছে। এই চুক্তির পোশাকি নাম লজিসটিকস সাপোর্ট এগ্রিমেন্ট (এল এস এ)। এই চুক্তি সম্ভবপর হলো মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব অ্যাসটন কার্টার এবং ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোহর পরিক্করের বিশেষ বৈঠকের পরই। তবে পূর্ণাঙ্গ চুক্তিটি রূপায়ণের মুখ দেখতে আগামী কয়েক সপ্তাহ সময় লাগতে পারে বলে প্রতিরক্ষা দপ্তর সূত্রের খবর।

কোনো কোনো মহল থেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে রটানো হচ্ছে এর ফলে আমেরিকা ভারতের ওপর কর্তৃত্ব কায়েম করার সুযোগ পাবে। যদিও কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী স্পষ্টই জানিয়েছেন, এই চুক্তির অর্থ এই নয় যে মার্কিন নৌবাহিনী ভারতের মাটি ব্যবহার করতে পারবে। চুক্তি কেবলমাত্র কার্যকর যুদ্ধজাহাজ ও যুদ্ধবিমানে জ্বালানি, জল ও খাদ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে। তাছাড়াও কিছু মানবিক ক্ষেত্র, যেমন নেপালে ভূমিকম্প বা অন্যত্র কোথাও প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি ব্যাপারেও এই চুক্তির প্রয়োগ হবে। চুক্তিটির খসড়া আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সব বিপত্তি কাটিয়ে চূড়ান্ত রূপ পাবে বলেও শ্রীপরিক্কর আশা প্রকাশ করেন।

প্রায় একদশক আগেই এই চুক্তির সুযোগ ভারতের সামনে এসেছিল। কিন্তু রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে পিছিয়ে আসে তৎকালীন ইউপিএ সরকার। এই চুক্তিতে ভারতই বেশি লাভবান হবে বলে

চুক্তি স্বাক্ষরের পর মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিবের সঙ্গে মনোহর পরিক্কর।

মনে করছেন কূটনৈতিক মহল। কারণ এধরনের চুক্তির ক্ষেত্রে আমেরিকার অভিজ্ঞতা রয়েছে প্রায় পঞ্চাশটি দেশের সঙ্গে এরকম চুক্তি করার। কিন্তু ভারতের সেই অভিজ্ঞতা এখনও হয়নি। সুতরাং আমেরিকার সঙ্গে তার এব্যাপারে অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার সুযোগও থাকল। ফলে কূটনৈতিক ও প্রতিরক্ষা উভয়ক্ষেত্রেই ভারতের অবস্থান আরও দৃঢ় হবে বলে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

চুক্তির মধ্যে জ্বালানি, জল ও খাদ্যের জোগানের শোধ দেওয়ার ভিত্তি প্রসঙ্গে শ্রী পরিক্কর স্পষ্ট করে দেন যে উল্লিখিত দ্রব্য কিংবা সমমূল্যের ভিত্তিতে সেই ঋণ মিটিয়ে দেওয়া হবে। চলতি মাসেই এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা চুক্তিটি যাতে সম্পন্ন হয় সেই ব্যাপারে ভারত সচেষ্ট হয়েছে বলে সূত্রের খবর। প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত আরও দু'টি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি যেমন 'কমিউনিকেশন ইন্টার অপেরাবিলিটি অ্যান্ড সিকিউরিটি মেমোর্যান্ডাম অব এগ্রিমেন্ট' এবং 'বেসিক এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড কো-অপারেশন এগ্রিমেন্ট'-এর ব্যাপারে সরকারি ভাবে এখনও কিছু জানান হয়নি। যদিও সূত্রের খবর, ভারত এ-সংক্রান্ত কোনো চুক্তির ক্ষেত্রেই তাড়াহুড়ো করতে চাইছে না। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে।

বায়ু শক্তি শিল্পে বিপ্লব ঘটিয়েছে ইনফোয়িস

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ "ভারতের উপকূলসমূহ পরিবেশবান্ধব বায়ুশক্তির 'পাওয়ার হাউস'। হায়দরাবাদ স্থিত ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সেন্টার ফর ওশান ইনফরমেশন সার্ভিসেস (ইনফোয়িস) পরিবেশবান্ধব বায়ুশক্তির জন্য ভারতীয় উপকূলকে 'সোনার খনি' বলে অভিহিত করেছে। বৈজ্ঞানিকদের মতে তামিলনাড়ুর দক্ষিণ উপকূল এবং মহারাষ্ট্র, গুজরাটের উপকূলও বায়ু শক্তি জাত বিদ্যুৎ উৎপাদনের বড় কেন্দ্র হতে পারে। প্রবল বায়ুপ্রবাহের জন্য পরিচিত ধনুষ্কোটি উপকূলে বছরে তিনশো-র বেশি দিন প্রতি সেকেন্ডে ছয় মিটার বেগে বায়ু প্রবাহিত হয়। আর দু'শো দিন এই বেগ থাকে প্রতি সেকেন্ডে ৮ মিটার। যদি দক্ষিণ তামিলনাড়ুতে ২৫ কিলোমিটার অন্তর ৮০ মিটার ব্যাসযুক্ত আবর্তনশীল টারবাইন স্থাপন করা যায় তবে প্রতি বছর ৪.৬ গিগাওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছেন গবেষক নায়ার।

ঈশ্বরপুরে শ্রীরামনবমীর শোভাযাত্রায় লক্ষাধিক মানুষের ঢল

ছবি : বাসুদেব পাল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১৫ এপ্রিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তর দিনাজপুর জেলার (উত্তরবঙ্গ প্রান্ত) ঈশ্বরপুর প্রখণ্ডের উদ্যোগে এক বিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে শ্রীরামনবমী পালিত হলো। শ্রীরামের বিশাল প্রতিমা পূজার মাধ্যমে উৎসবের সূচনা হয়। স্টেট ফার্ম কলোনির সূর্যসেন ক্লাব প্রাঙ্গণে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে রামনাম সংকীর্তন, প্রসাদ বিতরণ এবং উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক গৌতম সরকারের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর শোভাযাত্রার শুভারম্ভ হয়। শোভাযাত্রার সামনে উৎসাহ উদ্দীপনা ও উন্মাদনায় ভরপুর যুববাহিনী। অনেকের হাতে বিরাট আকারের গৈরিক পতাকা। মাঝে ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা, শ্রীরামরথ সম্মুখে দণ্ডায়মান গদাহাতে শ্রী হনুমান, রাম লক্ষণ, সীতা-র সাজে ট্যাবলো। কেবল যুবক নয় পুরো শোভাযাত্রার দৈর্ঘ্য কয়েক কিলোমিটার, বড় বড় বক্সে বাজনা বাজছে, তরুণ, যুবক, মধ্যবয়সী থেকে ক্ষুদে শিশু কে নেই! কপালে গৈরিক কাপড়ের ফেট্টি বা পতাকা হাতে। অনেক মায়ের কোলে বা এখনকার হালফিলের টোটোতে চড়ে। সবরকম বয়সের, সবরকম শ্রেণীর মানুষ। কাতারে কাতারে। 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলছে। কেবল দ্বারিভিট থেকে ৩০টা বড় গাড়ি ও ২০টা মোটরবাইকে রামভক্তরা এসেছেন। সব থেকেই উৎসাহ বোধহয় কচিকাঁচাদের। নবীন যুবক-যুবতী এবং বোনেদের সংখ্যাই সর্বাধিক। সবই স্বতঃস্ফূর্ত। স্থানে স্থানে জলসত্র। সরবত ও ঠাণ্ডাজল এগিয়ে দিচ্ছেন ঈশ্বরপুরবাসীরা। শুরুর স্থান থেকে সমাপ্তি স্থানে যেতে সময় লাগল প্রায় আড়াই ঘণ্টা। মাঝে মাঝে কেউ কেউ রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে বা বসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছেন। নিচ্ছেন স্থির, সেলফি, ভিডিয়ো। মোবাইলে শোভাযাত্রা ধরে রাখছেন। যাঁরা শোভাযাত্রায় যোগ দিতে পারেননি তাঁরা দর্শনার্থী। বাড়ি থেকে পথে বের হয়ে এসেছেন। উদ্যোক্তরা জানালেন, বিগত কয়েকবছর সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ইসলামপুরে রামনবমী এভাবেই পালিত হয়ে আসছে। এবার যোগদানকারীর সংখ্যা লাখ ছাড়িয়েছে। গত বছর রাজ্যের মন্ত্রী ও স্থানীয় বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী এই শোভাযাত্রাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এবার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী ডাঃ সৌম্যরূপ মণ্ডল স্বাগত জানিয়ে একটা ব্যানার লাগিয়েছেন সমাপ্তিস্থল জীবনমোড় জুনিয়ার হাইস্কুলের কাছে। শেষে নিজেও এসেছিলেন। রাস্তায় দু' ঘণ্টার যানজটের কারণে কাউকে বিরক্ত হতে দেখা যায়নি। সবাই উৎফুল্ল উৎসাহিত। সব থেকে অবাক করার মতো হলো— শহরের ৮নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হাজি মুজফ্‌ফর হুসেন কয়েকজন মা-বোনেকে নিয়ে একটা এন জি ও-র নামে ব্যানার লাগিয়ে জল-বাতাসা খাওয়াছেন আর অনবরত বলে যাচ্ছেন শ্রীরামচন্দ্রের কথা, জীবন ও বাণী সবাইকে গ্রহণ করতে। বলতে ভুললেন না—তিনি বিজেপি নন, জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য। ইসলামপুর— ঈশ্বরপুর— সেদিন শুধুই শ্রীরামপুর।

ভাষার অজ্ঞতাই ‘ভারতমাতা কী জয়’ নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে : ইন্দ্রেশকুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। শুধুমাত্র ভাষার অজ্ঞতার কারণেই ‘ভারতমাতা কী জয়’-এর বিরোধিতা করা হচ্ছে। কোরানে মুসলমানদের স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে ‘মাদর-ই-ওয়তন’ অর্থাৎ মাতৃভূমিকে শ্রদ্ধা করতে’। গত ১৬ এপ্রিল নাগপুরে মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের তিনদিনের এক সমাবেশে মঞ্চের আহ্বায়ক ইন্দ্রেশকুমার কথাগুলি বলেন। তিনি মোল্লা-মৌলবিদের কাছে জানতে চান, যারা এই ধ্বনির বিরোধিতা করেন তারা কেন মালা পরেন? আর কেনই বা তাঁরা বিশেষ ভঙ্গিতে আল্লার কাছে প্রার্থনা জানান? সেটা তো মূর্তিপূজারই নামান্তর।

শ্রীকুমার মঞ্চের জাতীয় কার্যকারি সমিতির সদস্যদের জানান, কোরানে পরিষ্কার ভাবে গোরুকে উপকারী প্রাণী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা থেকে বিভিন্ন রোগের ওষুধ পাওয়া যায়। মক্কা ও মদিনায় গোহত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাই গোহত্যা বা গোমাংসের ওপর নিষেধাজ্ঞা ইসলামের ওপর আঘাত নয়।

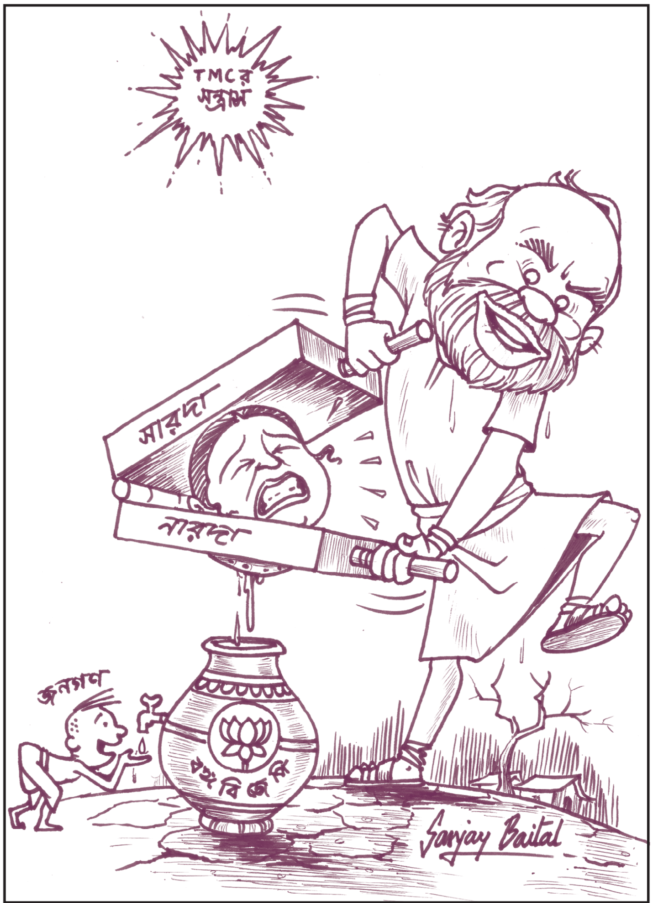

উবাচ

“কেন এমন ঘটছে যে কিছু লোক হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নিচ্ছে, কোম্পানি তৈরি করছে, পরে কোম্পানি রুগ্ন বলে ঘোষণা করছে আর সাধারণ মানুষের টাকা নিয়ে ফূর্তি করছে। অন্যদিকে বিপদের সময় ঋণ নেওয়া মাত্র কয়েক হাজার টাকা ঋণ ফেরত দিতে না পারার জন্য দরিদ্র কৃষকদের নির্যাতন করা হচ্ছে?”

সুপ্রিম কোর্ট

“গণতন্ত্রের প্রত্যেকটি অঙ্গেরই নিজের সীমার মধ্যে কাজ করা উচিত। অন্যের কাজের মধ্যে মাথা গলানোর দরকার নেই। আমাদের সংবিধানে রাজ্যের তিনটি অঙ্গের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে বলা হয়েছে। সংবিধানই সবার শীর্ষে।”

প্রণব মুখার্জী
ভারতের রাষ্ট্রপতি

“যদি দেখা যায় ‘টেপ’ (স্টিং অপারেশনের ছবি) সত্য, তবে পুরো ব্যবস্থাটারই গভীরভাবে তদন্ত করতে হবে।”

নারদা টেপ প্রসঙ্গে।

মঞ্জুলা চেল্লুর
প্রধান বিচারপতি,
কলকাতা উচ্চ আদালত

“মোদীর আসা কেরলের পক্ষে স্বস্তিকর।”

বাজির আগুনে পুড়ে যাওয়া মানুষদের প্রধানমন্ত্রীর দেখতে আসা প্রসঙ্গে।

উমেন চণ্ডী
মুখ্যমন্ত্রী, কেরল

“আমি মনে করি, সন্তোষজনক অবস্থায় পৌঁছতে এখনও বাকি আছে। আমরা বলতে পারি— অন্ধের দেশে একচক্ষু রাজা (বন দেশে শিয়াল রাজা)।”

ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, আই এম এফ, জি-২০ গোষ্ঠীর অর্থমন্ত্রী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গভর্নরদের বৈঠকে ভারতের প্রসঙ্গে।

রঘুরাম রাজন
গভর্নর, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

তৃণমূলকে ভোট দিলে আপনাকেও চোর-ডাকাতদের খাতায় নাম লেখাতে হবে

লড়াইটা ছিল কেষ্ট মণ্ডলের দলবলের সঙ্গে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের। লড়াইয়ের ময়দান ছিল বীরভূম জেলার ১১টি বিধানসভা কেন্দ্র। তৃতীয় দফার ভোট। দিনের শেষে দেখা গেল কলির কেষ্ট ১১-০ গোলে নির্বাচন কমিশনকে গোহারা হারিয়ে বীরভূম জেলা থেকেই ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছে। পরাজিত কমিশন যে আদতে কাগুজে বাঘ তা আগেই বুঝিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিরুদ্ধে শো-কজের চিঠির জবাব নিজে না দিয়ে। তাঁর বকলমে জবাব দেন রাজ্যের মুখ্য সচিব। এটি পুরোপুরি বেআইনি। ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচন কমিশন কোনো ব্যক্তিকে শো-কজ করলে তার জবাব সেই ব্যক্তিকেই দিতে হয়। অন্য কেউ দিতে পারে না। কিন্তু কমিশনের মমতা ভীতি এতটাই যে সব জেনেও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নাসিম জাইদি দিদির পরিবর্তে মুখ্যসচিবের জবাবদিহিকে মেনে নিয়েছেন। আর এতেই ভরসা পেয়েছে দিদির আদরের কেষ্ট। বীরভূমের ১১টি বিধানসভা কেন্দ্রেই গুড় বাতাসা দিয়ে অবাধে রিগিং চালিয়েছে। কমিশনের হিম্মত হয়নি কেষ্টর দলবলকে বাধা দেওয়ার। কেষ্ট মণ্ডল টিভি ক্যামেরার সামনে বুক বাজিয়ে বলেছে, 'আমাকে নজরবন্দি করার ক্ষমতা কারো নেই।' পাঞ্জাবির বুকপকেটে তৃণমূলের ঘাসফুল প্রতীক লাগিয়ে কেষ্ট বোলপুরে তার বুথে ঢুকে সদর্পে ভোট দিয়েছে। বুকে দলীয় প্রতীক লাগিয়ে ভোটকেন্দ্রে ঢোকা নিষিদ্ধ বা বেআইনি জেনেও বুথের ভোটকর্মীরা এবং কমিশন নিযুক্ত আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা কেষ্টকে বাধা দেয়নি। বরং বলা ভাল বাধা দেওয়ার সাহসই পায়নি। কমিশন নয়, বীরভূমে কেষ্ট মণ্ডলই শেষ কথা বলে। তার দাপটে জেলা শাসক থেকে নির্বাচন কমিশন সকলেই কেষ্টর ঘাটে জল খায়।

রঘু ডাকাতের অনুকরণে কেষ্ট মণ্ডল নির্বাচন কমিশনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আগাম ঘোষণা করেছিল যে বীরভূম জেলার ১১টি বিধানসভা কেন্দ্রের তামাম বুথে বিরোধী দলের এজেন্টদের ভ্যানিশ করে দেওয়া হবে। সব বুথেই শুধু তৃণমূলের এজেন্টরাই থাকবে। বুথের প্রিসাইডিং অফিসার-সহ সমস্ত ভোটকর্মীদের দায়িত্ব হবে একমাত্র তৃণমূল সমর্থক ভোটারদের ইভিএম মেশিনে বোতাম টিপে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করা। কেষ্ট মণ্ডল তার কথা রেখেছে। কমিশনের কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে কমিশনের নজরদারদেরই কেষ্ট ভ্যানিস করে দিয়েছে। কমিশনের পর্যবেক্ষকদের টিকিটিও দেখা যায়নি। কেষ্টকে নজরবন্দি করার দায়িত্বে যারা ছিল তারা কেষ্টর সৌজন্যে মাংসভাত খেয়ে সারাদিন নিখোঁজ হয়েছিলেন। সোজা কথায়, বীরভূমে ভোটকে প্রহসনে পরিণত করে কেষ্ট মণ্ডল দেখিয়ে দিয়েছেন যে সে নির্বাচন কমিশন এবং দেশের সংবিধানের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। অনেক বেশি ক্ষমতাবান। একটা দলের জেলা সভাপতির যদি এমন দাপট হয় তবে সেই দলের সর্দারণীর ক্ষমতার হাত কতটা লম্বা একবার ভেবে দেখুন। এরপরেও তৃণমূলকে ভোট দিলে আপনাকেও চোর ডাকাতদের খাতায় নাম লেখাতে হবে।

গূঢ় পুরুষের কলম

বীরভূমে বিরোধী দলের কর্মী সমর্থকদের জবাবদিহি করতে হবে তাঁরা কেন কোনো প্রতিরোধ গড়তে ব্যর্থ হলেন। বীরভূমে এবার গুড় বাতাসার ভোট হবে জেনেও তাঁরা রুখে দাঁড়ালেন না কেন? কাপুরুষের মতো পালালেন কেন? হ্যাঁ, বিরোধীদেরও জবাবদিহি করতে হবে মানুষের কাছে। অন্যায় যারা মেনে নেয় তারাও সমান অপরাধী। সব দায়িত্ব শুধুই কমিশনের। বিরোধী দলের কোনো দায় দায়িত্ব নেই সে কথা আমি মানি না। সমস্ত হুমকি সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে সাংবাদিকরা যদি ভোট লুঠ করার ছবি প্রতিবেদন মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারেন তবে বিরোধী দলের কর্মীরা এলাকা ছেড়ে পালালেন কেন? মনে রাখতে হবে সাংবাদিকরা আর পাঁচজনের মতোই সাধারণ পরিবারের সন্তান। তাঁদের কোনো সাংবিধানিক রক্ষা কবচ নেই। তাঁরা গুণ্ডাদের হাতে খুন হয়ে গেলে তাঁদের পরিবারের পাশে কেউ দাঁড়াবে না। সংবাদমাধ্যমের পরিচালকরাতো দাঁড়াবেই না। পশ্চিমবঙ্গের কোনো সংবাদমাধ্যম তাদের রিপোর্টারদের জীবনবীমা করে দেয় না। তবু মানুষের স্বার্থে, গণতন্ত্রের স্বার্থে সাংবাদিকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিজেদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করেন। কেষ্ট মণ্ডলের উপর নজরদারির দায়িত্বে থাকা সরকারি অফিসার আর জওয়ানরা মাংস ভাত খেয়ে পালাতে পারে। সামান্য বেতনের সাংবাদিকরা পালান না। ছায়ার মতো কেষ্টকে অনুসরণ করেন। বুক চিতিয়ে প্রশ্ন করেন দলীয় ব্যাজ বুকে লাগিয়ে তিনি বুথে ঢুকে ভোট দেন কীভাবে। লাভপুরের তৃণমূল নেতা শেখ সোয়েব আলি বুথে প্রিসাইডিং অফিসারের পাশে বসে ভোট পরিচালনা করছে সেই ছবি সাংবাদিকরাই তুলে দেখিয়েছেন। সাংবাদিকরা সাহস দেখাতে পারলে বিরোধী দলের কর্মীরা ভীত হয় কেন? জবাব দিতে হবে। কমিশনকে জবাব দিতে হবে তার পর্যবেক্ষকরা কোথায় ছিলেন। বুথের সিসি টিভি ফুটেজ দেখা হচ্ছে না কেন? যদি সাংবাদিকদেরই সব দায়িত্ব নিতে হয় তবে কমিশনের পর্যবেক্ষকদের কাজটা ঠিক কী তা স্পষ্টভাবে কমিশনকে জানাতে হবে। কেষ্ট মণ্ডলের ভয়ে যদি পালাতে হয় তবে কমিশনের পেয়াদাদের রাখার প্রয়োজনটাই বা কি আছে। ■

স্বয়ং নারদ এলেও দিদিকে হারাতে পারবে না

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,

আপনি এখন যেভাবে চরকি কাটছেন তাতে চিঠি লেখার কোনো মানে হয় না। পুরোটা ফোনে শুনিয়ে দিলেই ভাল হোত। তাই ঠিকানা ছাড়াই চিঠি। জানি আপনার কাছে ঠিক পৌঁছে যাবে। কারণ, আপনি সর্বত্র আছেন।

কলকাতায় আসছেন নারদ। কলির নারদ ম্যাতু স্যামুয়েল। সেটা আবার কলকাতার ভোটের আগেই। 'বেঙ্গল স্টাডি সার্কেল' না কী যেন নামের একটি সংগঠন ম্যাথুকে সংবর্ধনা দেবে। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ— একই মঞ্চ থেকে ম্যাথুকে সংবর্ধনা দেবে সারদা, রোজভ্যালি-সহ একাধিক ভুয়ো অর্থলগ্নি সংস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত আমানতকারী এবং এজেন্টদের 'সুরক্ষা মঞ্চ'!

এটা কি ঠিক হচ্ছে দিদি! আপনার রাজ্যে, আপনার শহরে বসে আপনারই চুল ছিঁড়বে! নারদায় বিদ্ধ মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চায়েতমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম (ববি) এবং নন্দীগ্রামের প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর কেন্দ্রে ভোটের আগেই এই নারদাগমন মোটেই ঠিক নয়।

এমনিতেই তো আপনি কেমন ভেঙে পড়েছেন। কলকাতার বৌবাজার এলাকায় এক জনসভায় বলেছেন, "হঠাৎ করে একটা বেআইনি কোম্পানিকে এনে কেন এসব করছ? ভোট ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। প্রার্থী ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। আগে জানলে নিশ্চয়ই ভাবতাম। কিন্তু প্রার্থী ঘোষণার পর তো আর বদলাতে পারি না।"

কিন্তু কেন বললেন এমন কথা? লোকে কিন্তু নানারকম বলছে। কেউ বলছে, নরেন্দ্র মোদীকে ভয় পেয়েছেন। কেউ বলছে, ভবানীপুরে জেতাই নাকি আপনার পক্ষে মুশকিল। যাই হোক ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ, ওয়েবসাইটে যুব সম্প্রদায় যা বলছে সেটাই তুলে ধরলাম। আপনি কেন নারদকাণ্ড মেনে নিলেন তা নিয়ে খান পাঁচেক যুক্তিও খাড়া করেছে তারা—

১। কলকাতা-সহ শহরাঞ্চলের ভোট এগিয়ে আসছে। শহরের মানুষ নারদ-কাণ্ড নিয়ে রীতিমতো প্রভাবিত। বুঝেছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন আর তাই শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা বৃথা। তৃণমূলনেত্রী বুঝতে পেরেছেন, নারদ ফুটেজে ববি-শোভন- সুব্রত-শুভেন্দুদের টাকা নেওয়া দেখে ছি ছি করছেন মানুষ। এখন আর সেটাকে জাল বলে উড়িয়ে দেওয়ার উপায় নেই। এর পরে তাঁকেও লোকে বিশ্বাস করবে না।

২। 'সততা' শব্দটা ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইউএসপি। কিন্তু দু-দফার ভোটের পরে তিনিও বুঝতে পেরেছেন সেই ভাবমূর্তিতে ধাক্কা লেগেছে। উত্তরবঙ্গের ভোটও সেটা বুঝিয়ে দিয়েছে। যার অন্যতম কারণ নারদ-কাণ্ড। দলের অন্দরেই দুটি স্পষ্ট ভাগ। যাঁরা নারদ-কাণ্ডে অভিযুক্ত আর যাঁরা নন। কিন্তু এর জন্য যে ক্ষতি তাতে দুই পক্ষকেই ভুগতে হচ্ছে। কলকাতা-সহ আশপাশের জেলাগুলিতে এনিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বেশি।

৩। লোকসভার এথিক্স কমিটিতে তদন্ত যেভাবে হচ্ছে তাতে তৃণমূলের অভিযুক্ত পাঁচ সাংসদের পদ খোয়ানোর সম্ভাবনা খুবই বেশি। রাজ্যসভায় তৃণমূল কেন ছাড় পাবে, সেই প্রশ্নও উঠছে। কলকাতার শহিদ মিনারের সভায় নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'কংগ্রেস-বামেদের কারণেই নারদ তদন্ত রাজ্যসভার এথিক্স কমিটির কাছে পাঠানো যায়নি।' এটায় বিজেপি কতটা সুবিধা পাবে তার চেয়ে বেশি চাপ তৃণমূলের উপরে। কারণ, মোদীর বক্তব্যে ইঙ্গিত মিলেছে যে, বিজেপি এবার রাজ্যসভায় সক্রিয় হবে।

৪। নারদ-কাণ্ড প্রকাশ্যে আসার পরে দলের ভিতরেই প্রার্থী বদলের দাবি উঠেছিল। দীনেশ ত্রিবেদী নিজেই সেকথা বলেছিলেন। তখন তাতে তৃণমূলনেত্রী কান দেননি কেন? এমন প্রশ্ন উঠছে দলের অন্দরেই। নারদ ফুটেজে তাঁর নামও উঠেছে বারবার। তৃণমূলনেত্রীর ঘনিষ্ঠ নেতারাই মমতার টাকার উৎস, ভাইপো অভিষেকের টাকার উৎস, এমনকী দিল্লীর রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবমূর্তি নিয়ে কথা বলেছেন। এটা তাঁর নিজের কাছেও চাপের।

৫। তিনি প্রথমে বলেন, 'ভেজাল সিডি'। এর পরে বলেন, বিদেশের টাকার যোগ। আদালতে দলের পক্ষে বলা হয় 'ঘুষ নয় অনুদান।' শেষে দলীয় তদন্ত। কিছুতেই আমজনতাকে 'যোগাযোগ নেই' বোঝানো যাচ্ছে না। এটা বুঝেই এবার 'স্বীকারোক্তির রাজনীতি।' জেলে থাকা মদন মিত্রকে প্রার্থী করা নিয়েও কম সমালোচনা সইতে হচ্ছে না। নারদকাণ্ড নিয়ে বারবার উঠে আসছে সারদা প্রসঙ্গ। দিদি ভাইদের আড়াল করছেন এমন সমালোচনাও হচ্ছে। যুক্ত হয়েছে সিন্ডিকেট প্রসঙ্গ, অনুব্রত পর্ব।

সব মিলিয়ে নাজেহাল তৃণমূলনেত্রী। আমি কিন্তু এসব মানি না। আমি শুধু মানি 'দিদি'। দিদি নাম্বার ওয়ান।

— সুন্দর মৌলিক

কংগ্রেস-কমিউনিস্ট আঁতাত

ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

পশ্চিমবঙ্গের চলতি নির্বাচনে প্রাধান্য অর্জনের জন্য কিছুদিন ধরে কংগ্রেস ও সিপিআই(এম) দুই দলেরই কিছু নেতা এই ব্যাপারে প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। তাঁদের বক্তব্য হলো, রাজ্যের মানুষ এই ধরনের একটা আঁতাত চাইছেন। তাদের আরও যুক্তি— উভয় দলেরই নীচুতলার কর্মীরা এই ধরনের সমঝোতার পক্ষপাতী। দাবিটা তাঁরা দলের উচ্চতম মহলেও নিয়ে গিয়েছেন।

> পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্টদের এখন অন্তিম দশা— সাংগঠনিক অবস্থা এবং দলগত অবস্থানের দিক থেকে তাদের চলছে এক ঘনীভূত বিপর্যয়। কংগ্রেসের অবস্থাও অনুরূপ। তার ফলে দুই দলের কিছু নেতা মনে করেছেন একটা সমঝোতা সম্ভবত তাঁদের রক্ষা করতে পারবে।

কিন্তু এটাও লক্ষণীয় যে, দুই দলের নীচু সারির বহু কর্মী এটা চান না। তাঁদের অনেকে দল ছেড়েছেন, কেউ কেউ তাঁদের আপত্তি জানিয়ে দলের কেন্দ্রীয় অফিসে পোস্টারও সেঁটেছেন। সবমিলিয়ে জিনিসটা বেশ জটিল হয়ে উঠেছে।

একটু পুরনো কথা বলি। একটা সময় আমাদের দল-ব্যবস্থাকে বলা হোত 'One dominant party system'—(ডব্লিউ, এইচ. মরিসজোন্স্—গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স অফ ইন্ডিয়া, পৃ. ১৭০)। তার কারণ আমাদের দেশে বহু-দলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত হলেও দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেসের একাধিপত্য বজায় ছিল। স্বাধীনতার আগেই মুসলিম লীগ, সিপিআই, হিন্দু মহাসভা ইত্যাদি রাজনৈতিক দলের অবির্ভাব ঘটলেও তাদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত নগণ্য। স্বাধীনতার পরে আরও বহু দল উদ্ভূত হলেও কংগ্রেস কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোতে একচ্ছত্র শাসন চালিয়েছে। বলা চলে, সেই সময় কংগ্রেসই ছিল দেশ— (গ্রেন্‌ভিল অস্টিন— দ্য ইন্ডিয়ান কন্‌স্টিটিউশান, পৃ. ৮-৯)।

অবশ্য গান্ধীজীর বক্তব্য ছিল--- স্বরাজ-লাভই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য, সুতরাং স্বরাজ পাওয়ার পর কংগ্রেসকে ভেঙে দিতে হবে। কিন্তু ততদিনে কংগ্রেসের বহু নেতা ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছেন, তাঁরা কংগ্রেসকেই কেন্দ্র করে ক্ষমতা রেখে দিতে চেয়েছেন। তাই তাঁরা গান্ধীজীর এই প্রস্তাব আদৌ মানেননি। ড. বি সিং রাউত মন্তব্য করেছেন, 'However, this suggestion of Gandhiji was not accepted by the leading congressmen of that time'— (ডেমোক্রেটিক কন্‌স্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া, পৃ. ১৯২)।

অবশ্য গান্ধীজী নিজেও ছিলেন প্রচণ্ড ক্ষমতালোভী, তিনি চিরদিনই পেছন থেকে সবাইকে চালাতে চেয়েছেন। নেহরু লিখেছেন, গান্ধীজী চাইতেন সবাই তাঁর মতেই চলুক— 'and was prepared to drive others or make them conform'— (অটোবায়োগ্রাফি, পৃ. ১২৭)। নেহরুও সেটা চেয়েছেন। তার সঙ্গে রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্যাটেল, ট্যন্ডন, ড. জন্ মাথাই প্রমুখের বিরোধ বেঁধেছে। ভিন্ন ভিন্ন দল করেছেন অশোক মেটা, রাজাগোপালাচারী, আচার্য কৃপালনী প্রমুখ। সরে গেছেন জয়প্রকাশ নারায়ণও। ইন্দিরা গান্ধীর যুগেও দুবার দল ভেঙেছে।

এভাবে কংগ্রেস ক্রমশ দুর্বল হয়ে গেছে। তার ওপর রাজ্যে রাজ্যে জাতপাত, ধর্ম, ভাষা, ব্যক্তিত্ব, স্বার্থবোধ প্রভৃতিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে শ'-চারেক রাজনৈতিক দল। আনুগত্যের এই বিভিন্নতার ফলে কংগ্রেসের আধিপত্য ও আসন সংখ্যা কমেছে। বিভিন্ন রাজ্য চলে গেছে বিভিন্ন দলের হাতে। রাজীব গান্ধীর পর (১৯৮৯) কংগ্রেস কেন্দ্রে মাত্র তিনবার ক্ষমতায় এসেছে, কখনও একক-গরিষ্ঠতা না পেয়েই, কখনও ইউপিএ জোট গঠন করে।

আসলে, কংগ্রেসের পক্ষে জোট গঠনের ব্যাপারে কোনো তাত্ত্বিক বাধা নেই, তার সুবিধেমতো বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেস খুঁজেছে ভোট-সঙ্গী। তার লক্ষ্য হলো, হারানো ক্ষমতা-স্বর্গ ফিরে পাওয়া— ড. জে.সি. জোহারির ভাষায়— 'to regain the lost paradise of power।'

আসলে, কোনো সুস্পষ্ট রাষ্ট্রদর্শন নিয়ে কংগ্রেস গড়ে ওঠেনি। নানা মত ও পথের মিলন ঘটেছে এখানে। ড. জোহারি

তাই এটাকে বলেছেন, 'party of parties'— তার মধ্যে রয়েছে 'various competitive factions operating within its fold'—ঐ, পৃ. ৯৫১)। ১৯০৫ সালে চরমপন্থী-নরমপন্থী দ্বন্দ্ব ঘটেছে। তার পরে দেশবন্ধু, মোতিলাল নেহরুরা তার ভেতর 'স্বরাজ্য দল' ও সুভাষ চন্দ্র 'ইন্ডিপেন্ডেন্স্ লীগ' গড়েছেন। ১৯৩৪ সালে 'কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল (সিএসপি) কংগ্রেসে প্রাধান্য বিস্তার করায় গান্ধীজী কংগ্রেস ত্যাগ করেছেন। ১৯৩৬ সালে লখনউ কংগ্রেসে নেহরু সভাপতি হয়ে সমাজতন্ত্রের কথা বলায় প্যাটেল, আজাদ প্রমুখ বারো জন ওয়ার্কিং কমিটি ছেড়েছেন। প্যাটেল শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের টেনে এনেছেন। রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ নেতা হিন্দুত্বের প্রবক্তা হয়েছেন— অথচ মৌলানা আজাদ আনতে চেয়েছেন সমন্বয়।

কোনো নির্দিষ্ট রাষ্ট্রতত্ত্ব এই দলকে পথনির্দেশ দেয়নি। নেহরুর আমলে (১৯৫৬) আবাদী-কংগ্রেস, 'socialist pattern of society'-কে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল, ১৯৭৬ সালে ইন্দিরা গান্ধীর যুগে গ্রহণ করা হয়েছে 'socialism'--- তত্ত্ব। অথচ বাস্তব রাজনীতি চলেছে অন্য পথে।

এমনকী, গান্ধীজীও কোনো রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বা অর্থনীতিবিদকে অনুসরণ করেননি—(ভি. টি. পাটিল-এসব হলপ্পা 'গান্ধীয়ান্ পলিটিক্স, প্র মডার্ন রিভিউ, আগস্ট, ১৯২৩)। দার্শনিক লেখক টলস্টয়ের 'কিংডম অফ গড', রাশকিনের 'আনটু দ্য লাস্ট', জৈনধর্মের শিক্ষা ইত্যাদিকে মিলিয়ে তিনি 'অহিংসা', 'সত্যাগ্রহ', 'অছিবাদ' ইত্যাদির অবতারণা করেছেন যেগুলো অধিকাংশ কংগ্রেসীরাই বোঝেননি।

এই সব কারণে জোট গঠনে থেকেছে ১৯৭৭ সালের নির্বাচনেও। এক্ষেত্রে কংগ্রেসের কোনো অসুবিধে হয়নি--- এক্ষেত্রে নির্ণায়ক হয়েছে শুধু রাজনৈতিক স্বার্থবোধ এবং অস্তিত্ব রক্ষার চিন্তা।

কিন্তু সিপিআই (এম) কংগ্রেসের দিকে হাত বাড়াল কেমন করে? অবশ্য এল এল সিক্রি লিখেছেন, আমাদের দেশের দলগুলো জোট গঠন বা সমঝোতার ব্যাপারে তত্ত্ব আদর্শের ধার ধারে না— 'Despite that emphasis on ideological commitment, the raison & ere of all political parties in India has been to capture power... In the recent years, even the CPI(M) in Bengal has diluted its communist identity to stay in power'— (ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স,পৃ. ১২২)। এই দল মুসলিম লীগের সঙ্গেও জোট করেছিল।

কমিউনিস্ট দলের তাত্ত্বিক ভিত্তি অবশ্যই মার্কসবাদ। তবে বাস্তবের চাপে নেতারা মার্কসবাদের বিপ্লবের অপরিহার্যতা, ধনতান্ত্রিক- মার্কসবাদীদের যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবিতা, রাষ্ট্রের অবলুপ্তি, শ্রেণীতত্ত্ব ইত্যাদিকে পরিহার করেছেন। ১৯৬৪ সালে রুশ-চীন দ্বৈরথকে ভিত্তি করে অবশ্য এই দেশের কমিউনিস্ট দল দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। তবে তাদের মতভেদটা ততটা তীক্ষ্ন নয়— ড. হরিহর দাসের ভাষায়— 'They differ probably in their methods rather than their ends'— (ইন্ডিয়ান ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ৩২০)। ১৯৬৯ সালে তারা কংগ্রেসের ভেতরেই ইন্দিরা গোষ্ঠীর মধ্যে 'প্রগতিশীলতার' লক্ষণ খুঁজে পেয়েছিলেন। লোকসভার মাত্র ২০৪ জন সমর্থককে নিয়ে ইন্দিরা গান্ধী শাসন চালিয়েছেন, তাঁর পেছনে ছিলেন দুই কমিউনিস্ট দলও— (কল্যাণ রায়— ইন্দিরা গান্ধী, পৃ. ১৩৪)। সিপিআই(এম) অবশ্য পরে তাঁকে 'স্বৈরাচারী ডাইনি' বলেছে, কিন্তু সিপিআই তাঁর সঙ্গে থেকেছে ১৯৭৭ সালের নির্বাচনেও। সঙ্গে পরবর্তীকালে অবশ্য দুই কমিউনিস্ট দল একযোগে কংগ্রেস বিরোধিতা করেছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে সিপিআই(এম) কংগ্রেসের ভেতর একটা গণতান্ত্রিক লক্ষণ ('democratic element') দেখতে পেয়েছে এবং সেইজন্য মারামারি সত্ত্বেও সমঝোতার পথ খুঁজছে--- (ড. এ সি কাপুর— দ্য ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সিস্টেম, পৃ. ৪৫৫)।

বিশেষ করে, পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্টদের এখন অন্তিম দশা--- সাংগঠনিক অবস্থা এবং দলগত অবস্থানের দিক থেকে তাদের চলছে এক ঘনীভূত বিপর্যয়। কংগ্রেসের অবস্থাও অনুরূপ। তার ফলে দুই দলের কিছু নেতা মনে করছেন একটা সমঝোতা সম্ভবত তাঁদের রক্ষা করতে পারবে--- চলতি বিধানসভা নির্বাচনে কিছু আসন বাড়বে।

অবশ্য তাঁদের সমঝোতা যদি ফলপ্রসূ হয়ও, দলীয় অবস্থার বোধ হয় তেমন তফাত হবে না— সেক্ষেত্রে তাদের এ-কূল ও-কূল দু-কূলই যাবে। কিন্তু বিকল্পও মনে হয় কিছু নেই। ড. হরিহর দাস লিখেছেন, 'The Indian communists are criticised for not having definits principles. It is said that they are gambling in political opportunism.' আর কংগ্রেসের দরকার ছিল নতুন নেতৃত্ব, নতুন তত্ত্ব। কিন্তু সেই পুরনো পরিবারতন্ত্রকে রক্ষা করতে গিয়ে দলটা ডুবন্ত নৌকোর মতো হয়ে গেছে। দুই মৃতপ্রায় রোগীকে এক বিছানায় শুইয়ে দিলেই কি তাদের আয়ু বৃদ্ধি ঘটবে?

(লেখক গবেষক, গ্রন্থকার ও প্রাক্তন রীডার—নিউ আলিপুর কলেজ)

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

রাজ্যের রাজধানীর পুলিশ কমিশনারকে সরিয়ে দেওয়া ভারতীয় নির্বাচনের ইতিহাসে নজিরবিহীন

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

এই নিবন্ধটি লেখার সময় পশ্চিমবঙ্গের ভোটপর্ব চালু হয়ে গেছে। বিভিন্ন জায়গায় শাসকদলের সঙ্গে বিরোধীদের সংঘর্ষ, মৃত্যু, রক্তপাতের খবর সংবাদপত্রের পাতা

অপসারিত পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার।

ভরিয়ে দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গবাসীকে এগুলি আর সেভাবে নাড়া দেয় না। বিগত তিন দশকের ভোট দাঙ্গার সংস্কৃতি তাদের অনেকটাই অসাড় করে ফেলেছে। কিন্তু রাজ্যের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা অবমাননাকর যে ঘটনাটি এই ভোটকে কেন্দ্র করে ঘটল, সেটি অভূতপূর্ব। রাজ্যের বিরোধীদলগুলি লাগাতার অভিযোগ জানিয়ে আসছিল যে, রাজ্যপুলিশ শাসকদলের পোষ্য হয়ে পড়েছে। তারা আর নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালনে সক্ষম নয়। এই অভিযোগগুলি কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন যথাযথ পর্যালোচনায় যে রেখেছিল তার মোক্ষম প্রমাণ তারা দিয়েছে। ভারতীয় নির্বাচনের ইতিহাসে নজিরবিহীনভাবে তারা মেগা সিটি কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীর পুলিশ কমিশনারকে যাকে বলে unilaterally পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। ইতিপূর্বে মহকুমা শাসক, জেলায় জেলায় পুলিশ সুপার থেকে জেলা শাসক অবধি বদলি হয়েছে। ক্রুদ্ধ মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন বদলের পর যে আসবে সেও তো আমার লোক। প্রশ্ন হচ্ছে, দেশের যে কোনো রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অধীনস্থ থেকেই কাজ করে। তারা কখনই স্বশাসিত সংস্থা নয়। কিন্তু পুলিশের দলীয়করণের যে প্রক্রিয়া বাম আমলে শুরু হয়েছিল সেটির কদর্যতম চেহারা আঁকলেন আমাদের চিত্রকর মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে প্রতিটি রাজ্যবাসীর নিরাপত্তা ও তার মৌলিক অধিকার রক্ষার নৈতিক দায়িত্ব তাঁরই। সেক্ষেত্রে যখন একের পর এক প্রশাসনের উচ্চস্তরে থাকা কর্তাব্যক্তি পক্ষপাতিত্ব অর্থাৎ অন্যপক্ষকে তার সংবিধানপ্রদত্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করায় মদত দিচ্ছে সেক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী শুধুমাত্র দল শক্তিশালী করতে কেন বলছেন যেই আসবে সেই তাঁর হয়ে একই কাজ করবে অর্থাৎ মানুষের অধিকার কেড়ে নেবে?

নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকারের সংরক্ষণ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অতীত উজ্জ্বল নয়। কিন্তু বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তাকে যে খুল্লামখুল্লা মান্যতা দিলেন তা রাজ্যবাসীর পক্ষে সত্যিই লজ্জাকর। আজকের টিভি, সোশ্যাল মিডিয়ার প্রাবল্যে মানুষের সবই দৃষ্টিগোচর। সেক্ষেত্রে কোনো ঘটনা ঘটলে আলোকসম গতিতে তা মানুষের শোয়ার ঘরে চলে আসছে। সেখানে শুধুমাত্র যুক্তিহীন মেঠো বক্তৃতা দিয়ে আর অস্বীকার করে যে পার পাওয়া যাবে না তারই ফলশ্রুতি পুলিশ কমিশনারের অপসারণ। রাজ্যবাসীর সঙ্গে প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে তাঁর মাথাও কি নীচু হলো না? যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় তিনি নির্বাচনে জিতলেন তাহলেও কি পুলিশ প্রধানের বকলমে তাঁর এই অসংসদীয় কাজকে মান্যতা দেওয়া যাবে।

মুখ্যমন্ত্রী মানুষের চক্ষুগোচর হয় এমন বেশকিছু সহজ কাজ রাজ্যবাসীর করের টাকায় চটজলদি জনপ্রিয়তা পেতে অবশ্যই করেছেন। দুমদাম যত্রতত্র আলো লাগানো বিশেষ করে শহরাঞ্চলের অলিতে গলিতে। এতে তিনি তো হাততালি পাবেনই। সঙ্গে শিল্পহীন রাজ্যে সিইএসসি তার উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ চড়া দামে সরকারকে বেচতে পারবে। সিইএসসি-র চেয়ারম্যান রমাপ্রসাদ

গোয়েঙ্কা-পুত্র সঞ্জীব গোয়েঙ্কা এখন মুখ্যমন্ত্রীর পার্শ্বচর। বিদ্যুতের মাশুল তারা খেয়ালখুশিতে বাড়ালেও কোনো প্রতিবাদ হয় না। সম্ভবত অতীতে তাঁরাও চিত্র-রসিক হয়ে উঠেছিলেন। সম্প্রতি এক পূর্বতনমন্ত্রী ও বাম বুদ্ধিজীবী মুখ্যমন্ত্রীর ছবির দর বেঁধে দিয়েছেন দশ থেকে বারো টাকার মধ্যে। অবশ্য সারদার পর চিৎকারে তাঁর শিল্পীমন গুটিয়ে গেছে। তবু মুখ্যমন্ত্রীর কাজের খতিয়ান দেওয়ার জন্য লেখাটি নয়। তাঁর শুধুমাত্র গোঁয়ার্তুমি ও অসাধু বদমাশদের প্রশ্রয় দিয়ে মানুষের তথা গোটা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও আইনের শাসকদের ধ্বংস করার প্রতিবাদেই লেখা। সাংস্কৃতিক অবনমনের এই প্রক্রিয়ায় সর্বশেষ সংযোজন অধ্যক্ষ নয় একেবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পড়ুয়াদের হাতে নির্যাতন।

স্মরণ করুন যেদিন সিবিআই মদন মিত্রকে সমন ধরাল কালাতিপাত না করে তিনি রাজপথে এককাঁড়ি লোক বের করে ফেললেন। এদের গরিষ্ঠাংশ অনুদানপ্রাপ্ত ক্লাবের দলদাস। সকলের বুকে লেখা ‘আমরা চোর, আমাদের গ্রেপ্তার কর’। বিশাল মিছিলের নেতৃত্বে তিনি স্বয়ং। পশ্চিমবঙ্গবাসীর মধ্যে এই ঠিক-বেঠিক বিচার করার নীতিবোধটিকে তিনি কৌশলে ও বহুক্ষেত্রে আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে লুপ্ত করে দেওয়ার যে একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় রত হয়েছেন তা সত্যিই নজির বিহীন। তিনি জোর করে সাঙ্গপাঙ্গ সমেত সময়ে ধরা পড়বেন। তাড়াহুড়ো করে আইনকে শাসাচ্ছেন কেন? আর একটি উদাহরণ দেখুন। সদ্য সমাপ্ত দ্বিতীয় পর্বের বাঁকুড়া, বর্ধমানে ভোটের দিন বুথে ঘুরছেন আদালতের সাজাপ্রাপ্ত আসামি সোহরাব আলি। নেত্রী আজব কায়দায় আসানসোলের আদালত থেকে আলির সাজার কাগজপত্র বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে আনার প্রক্রিয়া এমন বিলম্বিত করে দিয়েছেন যে তার বিধায়কপদ আজও খারিজ হয়নি। অথচ চিরকালীন পুকুরঘাটের ঝগড়ার ভঙ্গিতে এত বড় একটা বিষয় যার জন্য আদালত অবমাননার অভিযোগ আনতে পারে তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলছেন, ‘‘বেচারা সোহরাব, ওকে সিপিএম মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়েছে তাই প্রার্থী করতে পারিনি। ওর বউ দাঁড়িয়েছে। তিনি বিচারপর্বের পর সাজাপ্রাপ্ত আসামিও নন! আমাদের দেশেই প্রবল প্রতাপান্বিত বিহারেশ্বর ১৫ বছরের রাজ চালানো লালু যাদবও জেল খাটা আসামি। সাজা পাওয়ায় ৬ বছর ভোট লড়াই থেকে বঞ্চিত। উচ্চ আদালতে মামলা আছে তাই জামিন পেয়েছেন। তিনিও কিন্তু বিহারের এত বড় জাতীয় অভিঘাতময় ভোটেও কোনো বুথে ঘোরার অভিযোগে অভিযুক্ত হননি। কেন্দ্রের শাসকদল নীরবে পরাজয় মেনে নিয়েছে। কোনো জায়গায় তারা গুলি, বোমা মেরে ক্ষমতায় আসতে বিরোধী ভোট আটকায়নি। আর তাঁর আইপিএস অফিসার খোলা টিভি ক্যামেরায় ভোটে ঢালতে লক্ষ লক্ষ টাকা নিচ্ছেন। ধিক তাঁর প্রশাসনিক যোগ্যতাকে তাঁর ভারতখ্যাত সততাকে! তিনি তো প্রাথমিকভাবে পুলিশকর্তাকে সাসপেন্ড করবেন। তাঁর সংস্কৃতিতে সংস্কৃতিবান তস্কর গোত্রীয় মন্ত্রীরা যে কেউই লালকৃষ্ণ আদবানী হয়ে পদত্যাগ করবে না, যেটা প্রত্যাশিত কিন্তু সরকারি পদাধিকারী কী করে পদে থাকবেন? আইন কিন্তু বলছে জনপ্রতিনিধি ঘুষ নিয়ে ধরা পড়লে পদ ছাড়তে হবে। cash for vote কাণ্ডে অভিযুক্ত সাংসদদের পদ খোয়াতে হয়েছিল। এটিই হচ্ছে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকরণ। একটা সময়ের বিহারে সাহাবুদ্দিন, তসলিমুদ্দিন, সাধু যাদবরা যে চেষ্টায় রাজ্যটিকে রসাতলে পাঠিয়েছিল, দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী পশ্চিমবঙ্গকে আজ তিনি সেই কানাগলিতে নিয়ে চলেছেন। জগদ্দল অত্যাচারী stalinist দলকে পরাজিত করে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে যে আলোর ইশারা তিনি দিয়েছিলেন, এক ফুৎকারে ক্ষমতা ধরে রাখতে তিনি তা নিভিয়ে দিতে দু'বার ভাবলেন না। অনেকে বলেন সংস্কৃতি কী এতই ঠুনকো যে এত অল্প সময়েই তার ওলট-পালট হয়ে যায়। অবশ্যই হয়, একটি শান্তির সংসারে যদি হঠাৎ কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায় বা হঠাৎ কোনো মানুষ তাঁর রোজগার হারান লহমায় পালটে যায় পরিচিত অবয়ব। ভাবুন তো গার্ডেনরিচের হরিমোহন কলেজে যে কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার নিহত হলেন তার হত্যাকারী শেখ মুন্নার কী হলো? প্রায় দেড় বছর জেলবন্দী মদন কী ছলনায় ও তাঁর দিদির প্রশ্রয়ে রাজ্যের প্রধানতম হাসপাতালের ভিআইপি শয্যায় বসে আইনের শাসনকে বুড়ো আঙুল দেখালেন। কী নির্লজ্জ স্পর্ধায় এক ডাক্তার মন্ত্রী মানুষের জন্য নির্ধারিত যন্ত্রে কুকুরের ডায়ালেসিসের আদেশ দিয়ে চিহ্নিত হওয়ার পরও অবলীলায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বিষয়টা প্রকাশ পাওয়ায় কলেজ অধ্যক্ষ বদলি হয়ে গেলেন। এই উলটপুরাণ কোন সংস্কৃতির বাহক? এক একটি ধাক্কায় তিনি প্রচলিত রীতিনীতিগুলি তছনছ করে দিচ্ছেন। প্রশাসনে এসে হয়ত কোনো দল অভিজ্ঞতার ঘাটতিতে কাঙ্ক্ষিত দায়-দায়িত্ব পালন বা মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ মর্যাদা নাও দিতে পারে, কিন্তু এমন বেলাগাম, বেআইনি কাজকে আইনি তকমা পরাবেন? পোড়খাওয়া পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী বলছেন এমন দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার তিনি দেখেননি। তিনি তো ভোটে লড়ছেন না আর তার সঙ্গে কাজ করে অপদস্থও হননি। সামগ্রিক মূল্যবোধ ধ্বংসের কাণ্ডারির কালাপাহাড়ী ভূমিকার তিনি অবিসংবাদিত দাবিদার সমাজের।

আর তাঁর ভাষায় একেবারে সাম্প্রতিক একটি নির্বাচনী সভায় তিনি কংগ্রেস বাম জোট নিয়ে বলছেন, ‘‘গোরু হারালে বউকে মা বলে, কংগ্রেস সিপিএমের এমন তেমন হাল’’। রবীন্দ্রনাথের বঙ্গবাসী তাঁর ভাষা প্রয়োগের গর্ব করবে। সবাইকে কু-পথে, কুবাক্যে টানার তাঁর একটি বিরল ক্ষমতা আছে। সৌগত রায়ের টিভিতে ঘুষ

নেওয়া দেখার পর একটি ফেসবুক মতামতে উঠে এসেছে। সৌগতবাবুর এই কাজে মানুষ স্তম্ভিত। তাঁরা আকাশ থেকে পড়েছেন। নেত্রী কিন্তু তুরন্ত তদন্ত চেয়ে এর একটা 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' ফয়সালা চাইলেন না। অত প্রবীণ সুব্রতবাবু টাকা গোচ্ছাচ্ছেন! মুখ্যমন্ত্রী বিরল ক্ষমতাধারী। এই sting সত্যি হবেই। তবে ম্যাথু যে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথা বলেছেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ। নেত্রী আজ পূর্ণ কালিমালিপ্ত, তাই বেপরোয়া। সবাইকে কুকর্মে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাই এই বেপর্দাকারী ম্যাথুর জীবনের নিরাপত্তা একটা বড় প্রশ্ন বটেই। সারদাকাণ্ডের বিস্ফোরক নথি ধ্বংসের পর তিলমাত্র সুযোগে হয়তো ম্যাথুর সিডিগুলি গহ্বরে চলে যাবে। এটি তো গেল রাজ্যবাসীর বৌদ্ধিকস্তরের ভাঙন তরান্বিত করা বা তাকে নিম্নগামী করার প্রক্রিয়াকরণ। কিন্তু তিনি মানুষের দৈহিক নিরাপত্তার প্রশ্নেও সম্পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞানহীন হিসেবে স্মরণীয়া হয়ে থাকবেন। করদাতাদের সাদা টাকায় কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, গ্রামশ্রী চলছে আর দুষ্টু সিন্ডিকেটের কালো টাকা লড়ছে ভোটে। ভোটের প্রার্থীদের এক একজনের সম্পদ জোয়ারের তোড়ে আসা আবর্জনার মতো স্তূপাকার হয়ে উঠছে। উনি নির্বিকার। হয়তো ভাবছেন এদের তোলাশ্রী বা বালিশ্রী বা লোহাশ্রী খেতাব দিয়ে আরও মদত করা যায় কিনা? এরাই তো কালেক্টর। চালিকাশক্তি। সে ভাবুন, কিন্তু জোড়াসাঁকোর সেতু যখন ২৭ জনকে মেরে নাবল তখন তো তিনি প্রথমেই বললেন এ বাম আমলের কাজ। নির্মাণকারী সংস্থাটি কালো তালিকাভুক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি কাজ বন্ধ করালেন না কেন? এখন সব অনুসন্ধানকারী দল এসেছে। ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে মোটেই ভাল কথা বলেননি। এখন দেখা যাচ্ছে তাঁরই এক তস্কর শ্রেণীর নেতার আত্মীয় আর সিন্ডিকেটের লোকজনের দেওয়া মালেই ব্রিজের কাজ চলছিল। মানুষ এমন হালে তৈরি যে কোনো সেতুর তলা দিয়ে যেতে ওপরে দেখছেন। অবিশ্বাস্য আতঙ্কিত এলাকার বাসিন্দারা সেতু ভেঙে ফেলার দাবিতে মিছিল করছেন। ভাবা যায়! আর একটি অবহেলিত কিন্তু মোটেই গুরুত্বহীন নয় প্রায় সম্পৃক্ত খবর জানা জরুরি। (আ. বা. ১০।৪।১৬) হাওড়ার শিবপুর থেকে চাঁদপাল ঘাট যাওয়ার সদ্য নবীকরণ করা জেটিটি ৯।৪।১৬ তারিখে কোটালে বানের তোড় সামলাতে না পেরে ভেঙে পড়েছে। পারাপার অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ। জানা গেছে বছর দেড়েক আগে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ১ কোটি টাকা ব্যয়ে শিবপুর লঞ্চঘাট সংস্কার হয়। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুকরা বলছেন যে গুণমানের মালমশলা দরকার ছিল তার চেয়ে নিকৃষ্টমানের মালমশলায় জেটি সংস্কার হয়েছে। তাই এই বিপত্তি। মা-মাটি-মানুষের মান, জান দুটিরই আর কোনো পরোয়া যে তাঁর নেই তার পর্যাপ্ত প্রমাণ নেত্রী ক্রমাগত রেখে চলেছেন। তিনি এখন মুখোশহীন।■

"Om"

M/S. RAJ KUMAR BROTHERS
M/S. R. K. BROTHERS

IRONSTEEL, HARDWARE MERCHANTS
COMMISSION AGENT & GENERAL ORDER SUPPLIERS

STOCKIST OF :-

M.S WIRE ROD/ TMT, TATA HB, ANEALED & G.I. BARBED CONCERTINA WIRE, WIRENETTING & CHAIN LINK, WIRE NAILS, K.K. NAILS, PANEL PINS, TARFELT, BOLT NUTS & RIVETS, PLASTIC (POLYTHENE), PVC, GI, CORRUGATED SHEET, ELECTRODES & AGRICO TOOLS ETC.

167, Netaji Subhash Road, (Raja Katra), Kolkata-700 007
9330001340, 22580040/41
email : susilbagaria@yahoo.in

দুর্নীতিতে কমিউনিস্টরাও কম যায় না

অভিমন্যু গুহ

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের ক্ষেত্রে দুর্নীতিটাই দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এদের দুর্নীতির ধরন নিয়ে একটি চালু রসিকতা রয়েছে। যেমন এক বাটি দুর্নীতির দুধ কমিউনিস্টরাও খায়, কংগ্রেসীরাও। কমিউনিস্টরা দুধের বাটিটা শেষ করে এমনভাবে মুখ মুছে নেবে যে আপনি টেরটিও পাবেন না। আর কংগ্রেসিরা দুধটুকু খেতে গিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করে (গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের মাধ্যমে) যেভাবে মুখময় মাখিয়ে ফেলবে তাতে আপনি দিব্যি বুঝে ফেলবেন ওরা চুরি করতে গিয়েছিল। সম্প্রতি সারদা থেকে নারদ একের পর এক তৃণমূলী দুর্নীতির ঘটনায় এই রসিকতার তাৎপর্য বোঝা যাচ্ছে। কংগ্রেস জাত তৃণমূলের যাবতীয় আর্থিক কেলেঙ্কারি ক্রমশ প্রকাশিত হয়ে পড়ছে বলে সিপিএম ধোয়া তুলসীপাতা এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই।

চৌত্রিশ বছর যখন তারা ক্ষমতায় ছিল তখন তাদের বিরুদ্ধে হাজারো আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ ছিল। আর এই অভিযোগ শুধু বিরোধীরাই করেননি— করেছিলেন তৎকালীন জ্যোতিবাবুর সরকারের মন্ত্রী ও পরবর্তীকালে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ‘চোরেদের সরকারে থাকবো না’ বলে ১৯৯৩ সালে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি। পরে অবশ্য সেই চোরেদের সরকারেই ফিরে যান এবং কালে ‘চোরেদের মন্ত্রীসভা’র মুখ্যমন্ত্রিত্বও গ্রহণ করেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর পুত্র চন্দন বসু ছিলেন বেঙ্গল ল্যাম্পের সামান্য এক কর্মচারী। বামফ্রন্টের শিল্পনীতির সুবাদে সেই বেঙ্গল ল্যাম্প লালবাতি জ্বালার পর কোম্পানির বাকি কর্মীদের ভাত-জোটানোই সমস্যা হয়ে গিয়েছিল, তখন কোন মন্ত্রবলে চন্দন কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে গেলেন? প্রশ্নটা সহজ আর উত্তরও জানা। কিন্তু তখন নারদ নিউজ ছিল না। তাই স্টিং অপারেশনের শিকার হতে হয়নি চন্দনকে।

> “চোরেদের সরকারে থাকবো না বলে ১৯৯৩ সালে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি। পরে অবশ্য সেই চোরেদের সরকারেই ফিরে যান এবং কালে চোরেদের মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রীত্বও গ্রহণ করেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।”

সঞ্চয়িতা চিট ফাণ্ডের কথা সবার জানা। আজ সারদা নিয়ে যে ল্যাজে-গোবরে হচ্ছে তৃণমূল সরকার, সেদিন বাম সরকারের কপালেও একই জিনিস পাওনা ছিল বলে অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন। কিন্তু সিপিএমের অসাধারণ ম্যান-ম্যানেজমেন্ট আর সেকালের মিডিয়ায় আজকের সক্রিয়তা অনুপস্থিত ছিল বলেই দলের নেতারা রেহাই পেয়ে যান। রোজভ্যালির উত্থানের পেছনেও সিপিএমের হাত ছিল, জমানা পরিবর্তনে রোজভ্যালি কর্তা গৌতম কুণ্ডু জার্সি বদলালেও তাতে সিপিএম নেতাদের দোষস্খালন হয় না। হঠাৎ আঙুল ফুলে কীভাবে কলাগাছ হয়ে যাওয়া যায় তার নমুনা তো সিপিএম নেতারাই তাঁদের জমানায় দেখিয়ে এসেছেন। আজকের তৃণমূলের তোলাবাজি শিল্প সিপিএম জমানারই পরম্পরা মাত্র। কলেজে কলেজে এস এফ আই সদস্যরা কুপন কেটে রীতিমত তোলা তুলত (যার পোশাকি নাম অবশ্য ছিল চাঁদা কিংবা অনুদান)। সিপিএমের এককালের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেত্রী সরলা মাহেশ্বরী আর তার স্বামী অরুণ মাহেশ্বরীকে কি এতই সহজে ভোলা যায়? যাঁরা তাদের গাড়ির চালক সন্তোষ মাহাতোর নামে পাঁচ বছরে তিনশো একর জমি কিনেছিলেন। জমানা বদলাতেই ২০১২-র ১১ জন সরলাদেবীর স্বামী ও জামাইকে গ্রেপ্তার হতে হয়।

তৃণমূল ক্ষমতায় আসতেই এই যে

একশ্রেণীর সিপিএমের লোক জার্সি বদলাল তার পেছনে ক্ষমতা ধরে রাখার উদ্দেশ্য একটা ছিল কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু তার চেয়েও বেশি ছিল ধরা না পড়ার তাগিদ। যেসব জায়গায় তৃণমূলের অস্তিত্ব বরাবরই ছিল, সেসব ক্ষেত্রে এই দল বদলান সিপিএম নেতা-কর্মীরা একঘরে আর যেখানে বিগত জমানায় তৃণমূল দুর্বল ছিল, সেখানে এখন নব্য তৃমমূলী মানে প্রাক্তন সিপিএম কর্মীদেরই দাপট। তাদের দুর্নীতিও তাই অব্যাহত। জেলায় জেলায়, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে সিপিএমের যেসব বিলাস-বহুল পার্টি অফিস (যার কিছু এখন তৃণমূলের জিম্মায়) গড়ে উঠেছিল, দলের নেতাদের ভাষায় 'কৌটো নেড়ে টাকা তোলা', ভিক্ষের টাকায় কী এত বিলাসিতা করা যায়! ভিখিরিদের তো তবে বড়লোক বলতে হবে! বাম জমানায় আমাদের রাজনৈতিক চৌর্যবৃত্তির ট্রাডিশন তৈরি হয়েছিল, তৃণমূল আমলে তাকেই সযত্নে লালন করা হচ্ছে। পার্টিতে 'শুদ্ধিকরণ'-এর ডাক এমনি আসেনি। দুর্নীতিগ্রস্তরা তৃণমূলে 'শেল্টার' নিয়েছে বুঝতে পেরেই সেই আহ্বান এসেছিল। কিন্তু যেখানে রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি সেখানে 'শুদ্ধিকরণ' করতে গেলে যে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হবে তা সিপিএম নেতৃত্ব ভালোই বুঝেছিলেন। ২০১৩-র আগস্টে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য স্বীকার করে নেন সিপিএমে অবাঞ্ছিত ও দুর্নীতিগ্রস্ত পদার্থ ঢুকেছে। এইরকম স্বীকারোক্তি অবশ্য তাঁরা বারেবারেই করেছেন। ২০১২ সালের ১৭ থেকে ১৯ মার্চ দলের ২০ তম কংগ্রেস উপলক্ষে তার খসড়া রাজনৈতিক সাংগঠনিক প্রতিবেদনে স্বীকার করে নেওয়া হয় 'যৌন হয়রানি, দুর্নীতি' পার্টির মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে।'

কিন্তু এসব রোধ করতে সিপিএম কতটা আন্তরিক, সঙ্গতভাবেই সে প্রশ্ন উঠে। কেরলে গোটা পার্টিটাই আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জ। খোদ সাধারণ সম্পাদক পিনারাই বিজয়নের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করেছিলেন দলের বরিষ্ঠ নেতা তথা কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভি. এস. অচ্যুতানন্দন। ২০১৩-র নভেম্বর কেরলে আয়োজিত সিপিএমের তিনদিনের পার্টি প্লেনামের মূল লক্ষ্যই ছিল দুর্নীতি, মদ্যাসক্তি ও মাফিয়া সংযোগ থেকে রাজ্য সিপিএমকে মুক্ত করা। কিন্তু যে দলের খোদ এককালের সর্বোচ্চ ব্যক্তি (পড়ুন প্রকাশ কারাট) তাঁর পত্নী (তিনিও পার্টি নেত্রী, বৃন্দা কারাত)-কে নিয়ে বছর বছর বিদেশে বিলাসবহুল ছুটি কাটিয়ে আসেন স্রেফ পার্টির পয়সায়, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন, সেই দলের আয়ের উৎস জানতে কি আমাদের ঔৎসুক্য হয় না? বাটি নাড়িয়ে কি এত টাকা জোটানো যায়, যেখানে দলের সাধারণ 'হোলটাইমার' পার্টিকর্মীরাও রীতিমত ফাইভস্টার জীবন যাপন করতে পারেন?

এদের দলীয় ব্যবস্থা নেওয়ার ধরনটাও পার্টির সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেয়। যেমন ধরুন আরামবাগের সাংসদ অনিল বসুর কথা। যতদিন রিগিং, ছাপ্পা, হুমকি, বুথ দখল ইত্যাদি অপকর্মকে শৈল্পিক পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে রেকর্ড ভোটে জিতছিলেন ততদিন তিনি পার্টির কাছে ছিলেন সৎ রাজনীতিক। যে মুহূর্তে সিপিএমের সুদিন ঘুচলো, তিনি পার্টি লাইনের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন। পার্টির নেতারা ঝুলি থেকে বিড়াল বের করলেন। ২০১২-র এপ্রিলে যখন তাঁকে তিনমাসের জন্য সাসপেন্ড করা হয় দল থেকে, তখন তাঁর বিরুদ্ধে অন্যান্য অভিযোগের সঙ্গে দুর্নীতিও ছিল। তারপরেও ২২ মে তিনি চুঁচুড়ায় সিপিএমের পদযাত্রায় পা মিলিয়েছিলেন। তখনও তাঁর সঙ্গে পার্টি-নেতাদের একাংশের সদ্ভাব ছিল। কিন্তু তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী তথা হুগলি জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি অসিত পাত্র ওষুধ-কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে গ্রেপ্তার হওয়ার পরই পার্টি অনিলবাবুর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করে। কারণ তারা বুঝে যায় এবার আরও রাঘব- বোয়ালের নাম সামনে আসবে আর তাতে দলের সমূহ বিপদ।

সুতরাং এই 'শুদ্ধিকরণ'-এর রব যে আসলে পিঠ-বাঁচানোর কৌশল তা প্রমাণিত। শাক দিয়ে আর যাই হোক মাছ ঢাকা যায় না। ■

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিশেষভবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, সরাসরি ব্যাঙ্ক মারফৎ বা মণিঅর্ডার যোগে স্বস্তিকায় টাকা পাঠালে সেই টাকা কী বাবদ পাঠালেন তা সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিকা দপ্তরকে জানান। গ্রাহকদের টাকা পাঠালে তাঁদের সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা (ফোন নং-সহ) পাঠাতে হবে। অন্যথায় নাম না জানার কারণে আপনাদের পাঠানো টাকার কোনো রসিদ কাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন গ্রাহকের টাকা পাঠানো সত্ত্বেও যেমন পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না, তেমনই বকেয়া টাকার কারণে কারও কারও পত্রিকা সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচতে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে আপনি যদি ব্যাঙ্ক মারফৎ স্বস্তিকাতে কোনো টাকা পাঠিয়ে থাকেন তাহলে কবে পাঠিয়েছেন, কত টাকা পাঠিয়েছেন এবং কি বাবদ পাঠিয়েছেন অনুগ্রহ করে সত্বর আমাদের জানান। ব্যাঙ্ক মারফৎ টাকা পাঠালে ব্যাঙ্ক যে রসিদ আপনাকে দেয় সেই রসিদের জেরক্স কপিটা আমাদের পাঠালে ভালো হয়।

— ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

চিঠিপত্র

বিপদের মুখে ভারতবর্ষ

পাকিস্তানে মোতায়েন হবে চীনা সৈন্য। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বালুচিস্তানের গদর বন্দর থেকে চীনের ঝিয়াংজিয়াং প্রদেশ পর্যন্ত দখলে থাকবে চীনা সেনার। চীন পাকিস্তানকে উপনিবেশ বানাতে চায়, সেই সুযোগ পাকিস্তান করে দিচ্ছে শুধু ভারতকে জব্দ করার জন্য। কিন্তু এতে পাকিস্তান নিজেই জব্দ হয়ে যেতে পারে।

চীনের নজর রয়েছে ভুটান, নেপাল, মায়নমার, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশগুলির উপর। এই দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক থাকার জন্য চীন কিছু করার সাহস দেখাতে পারে না। একবার চীন যদি পাকিস্তান গ্রাস করে, তখন মাথা খুঁড়ে উপরওয়ালার কাছে বাঁচার জন্য পাকিস্তানীরা প্রার্থনা করলেও কিছু করার থাকবে না। কারণ দেশটার নাম চীন, যারা নিজেদেরকেও বিশ্বাস করে না।

এটাই তো বাস্তব। নেতারা শুধু রাজনৈতিক স্বার্থে পাকিস্তান পাকিস্তান চিৎকার করে। আসলে পাকিস্তান একটি দুর্বল দেশ। কোনো দেশ দুর্বল না হলে অন্য দেশের সেনাকে নিজের দেশে মোতায়েন করে না। আর চীন যে ভারতের প্রধান শত্রু এটা আমাদের দেশের নেতারাও খুব ভালোই জানেন। তাই দয়া করে নিজেদের ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থ পরিত্যাগ করে দেশের মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি না করে আসুন আমরা সমস্ত ভারতবাসী এক হয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাই, আর দেশের শত্রুদের উচিত শিক্ষা দেবার জন্য নিজেরা মানসিক ভাবে তৈরি হই।

কারণ পাক-অধিকৃত কাশ্মীর কখনোই স্বাধীন কাশ্মীর ছিল না, থাকবেও না। তাই পাক-অধিকৃত কাশ্মীরিদের কোনো কথার মূল্য না দিয়ে পাকিস্তান চীনের হাতের তুলে দিল। যা নিজের নয় সেটা অন্যকে দেওয়ার মতো নির্লজ্জ কাজ জঘন্য খুনি দেশ পাকিস্তানই করতে পারে। ৭১-এর খুনি পাকিস্তান বাংলাদেশের কাছে আজও ক্ষমা চায়নি।

—দেবজ্যোতি পণ্ডিত,
কাঞ্চনতার, মালদা।

ইসলামি অসহিষ্ণুতা

সম্প্রতি মহারাষ্ট্র বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে এ আই এম আই এম বিধায়ক ওয়ারিস পাঠান 'ভারতমাতা কী জয়' বলতে চাননি বলে তাকে সাময়িকভাবে বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড করা হয়। এই সিদ্ধান্তকে অবশ্যই স্বাগত জানাতে হয়। যদিও রাজ্যসভায় জাভেদ আখতার এই স্লোগানের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। তবুও একজন মুসলমান বিধায়কের এহেন জাতীয়তা বিরোধী মানসিকতা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও গর্হিত অপরাধ তা বলা অমূলক নয়। এর আগেও জমিয়ত-উলেমা-ই হিন্দ মুসলমানদের বন্দেমাতরম্ গাওয়া উচিত নয় বলে ফতোয়া দিয়েছিল। কারণ 'মাতরম্' নামক শব্দটি নাকি ইসলামে নিষিদ্ধ। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে বলা হয়েছে--- মাতা ভূমিঃ পুত্রোহহং পৃথিব্যাঃ'— অর্থাৎ এই ভূমি আমার মা, আমি সেই মায়ের পুত্র। তাই জন্মভূমি ও সমাজের প্রতি আত্মীয়তা ও মমতাকে প্রকাশ করা প্রয়োজন। আর 'ভারতমাতা কী জয়', ও 'বন্দেমাতরম্'-স্লোগানের মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজের গৌরবময় পরম্পরা ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর প্রেম ও গৌরববোধ প্রকাশ পায়। তাই এ জাতীয় স্লোগান না বলা জাতীয়তাবোধের পরিপন্থী। অতীতে ইউপিএ সরকারের আমলে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদাম্বরম্ এ ধরনের ঘটনাকে সমর্থন করেছিলেন। ভোগলালসায় লিপ্ত, দলগত রাজনীতিতে বিপর্যস্ত, সঙ্কীর্ণ বিচারধারার দ্বারা ভারতমাতার কষ্টকে উপলব্ধি করা যায় না। আর মুসলমানগণ একেশ্বরবাদী বলেই নাকি জাতীয় ভূখণ্ডকে মাতৃভূমি রূপে বন্দনা করতে পারে না। সে কারণেই হয়তো ওয়ারিস পাঠান 'ভারতমাতা কী জয়' বলতে চাননি, যা চরম অসহিষ্ণুতার পরিচয় বহন করে।

—সমীর কুমার দাস,
দ্বারহাট্টা, হুগলী।

দেশভাগের কাল থেকেই বাংলাদেশে অত্যাচারিত হিন্দুরা

সেই দেশভাগের (১৯৪৭) সময় থেকেই পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের (+সংখ্যালঘু) উপর নির্যাতন, অত্যাচার, হত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি চলে আসছে। তা এখনও বহমান।

ধরা যাক একাত্তর সালের কথা। তখন পাকবাহিনীর প্রধান টার্গেট ছিল হিন্দু সমাজ। তারা শুরু থেকে হিন্দুদেরকে হত্যা করেছে। হিন্দু নারীদেরকে ধর্ষণ করেছে। তাদের বাড়ি সহায় সম্পদ সব লুটপাট করেছে। আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। গুলির মুখে জীবিতদের দেশত্যাগে বাধ্য করেছে। দেশত্যাগ করে হিন্দুরা পথে পথে মরেছে, শরণার্থী শিবিরে মরেছে...।

এই হিন্দুদেরকে আশ্রয় দেওয়া মুসলমানদেরকেও পাকবাহিনী হত্যা করেছে। মুসলমান নারীদেরকেও ধর্ষণ করেছে। তাদেরও বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। লুটপাটের শিকার হতে হয়েছে। পাকবাহিনী ঘোষণা করে দিয়েছে, বাঙালি মুসলমানরা পূর্ণ মুসলমান নয়। তারা হিন্দু প্রতিবেশীদের সঙ্গে থেকে আধা হিন্দু হয়েছে। হিন্দুদের ষড়যন্ত্রে পা দিয়ে পাকিস্তানকে ভেঙেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে আবার জীবিত হিন্দুরা শরণার্থী শিবির থেকে দেশে ফিরেছে নিঃস্ব হয়ে। তাদের ঘর ছিল না।

ফসল ছিল না। টাকা ছিল না। খাবার ছিল না। শূন্য হাতেই তাদের আবার নতুন করে সব কিছু শুরু করতে হয়েছে। তারা মনে করেছে, নতুন রাষ্ট্রটি হবে মানবিক রাষ্ট্র। দানবের কোনো স্থান থাকবে না। মানুষই হবে রাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রধান পরিচয়। মাত্র দু' বছরের মধ্যেই দুর্ভিক্ষ মারাত্মক ছোবল হানলে তারাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারাই না খেয়ে মারা যায়। তারাই অপুষ্টির শিকার হয়। তারাই বেশি ঋণগ্রস্থ হয়। তারাই বেশি ভিখিরি হয়। তারা নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়ে পড়ে। রাষ্ট্র তাদের রক্ষা করেনি।

পঁচাত্তরের পরে পাকিস্তান-পন্থার দিকে রাষ্ট্রের উল্‌টো-যাত্রা শুরু হলে আবার এই হিন্দুরাই পাকিস্তানি ধারায় নিপীড়ন-নির্যাতনের লক্ষ্যে পরিণত হয়।

যুদ্ধে, দুর্ভিক্ষে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও কিন্তু হিন্দু সমাজ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠেনি। কলে পড়া ইঁদুরের মতো তারা নিজেদেরকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। দিনের পর দিন রাষ্ট্র প্ররোচনায়-প্রণোদনায়-উপেক্ষায় সংখ্যাগরিষ্ঠের সাম্প্রদায়িক শক্তির হিংসার নিত্য নতুন শিকারে নিজেদেরকে পরিণত করেছে। তাদের কোনো স্থান নেই রাষ্ট্র ক্ষমতায়, রাজনীতিতে, সমাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, সংবিধানে, আইনে, নিরাপত্তায়, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে। সব দিক থেকে একটি অত্যাচারিত জীব হিসেবে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশের হিন্দু সমাজ। এরা শুধু তাকিয়ে থেকেছে এই সেইসব মানুষের দিকে, যারা বাংলাদেশ ভূখণ্ডে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে ক্ষমতার ভেতরে-বাইরে আছে, যাদের মধ্যে ন্যূনতম শুভবোধ আছে, যারা একদা তাদের রক্তের আত্মীয় ছিল, সুখে ছিল, দুঃখে ছিল, ভালোবাসায় ছিল, বেদনায় ছিল, তারা আবার জেগে উঠবেন।

এই সাম্প্রদায়িক হিংসা নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন। হিন্দু বা মুসলমান হিসেবে নয়, খৃষ্টান-বৌদ্ধ-বা পাহাড়ি হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রকে বাধ্য করবেন।

—**সুনীল শর্মাচার্য,**
'অরণ্যা' আদর্শপল্লী, শ্যামনগর,
উত্তর ২৪ পরগনা।

আলু মহার্ঘ

একদা একটা কথা চালু ছিল--- মাছে-ভাতে বাঙালি। কিন্তু একদিন সেই মাছে-ভাতে বাঙালির পাত থেকে কালচক্রে উধাও হয়ে গেল মাছ। অগত্যা বাঙালি মজল ডাল-ভাতে। কিন্তু সেখানেও বিপত্তি। ডালের দাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থাৎ ডাল মহার্ঘ হয়ে পড়ায় বাঙালির পাত থেকেও উধাও হয়ে যায় ডাল। বাঙালি অতঃপর খাবেটা কী? তবে একটা কথা বলতেই হয়, আলুর প্রতি গড়বাঙালির একটা তীব্র আকর্ষণ বরাবরই ছিল। মাছের ঝোলে আলু, আলুভাতে বা সেদ্ধ, আলু ভাজা, আলুর ঝোল বা দম, আলু-সবজির তরকারি ইত্যাদি ছাড়াও মুখরোচক আলু-কাবলি, আলুর চপ, আলু-ফুচ্‌কা, আলু-পাঁপড়ি, আলুর পরোটা, আলু-ঘুগনি ইত্যাদির চল বহুদিনের। একমাত্র আলুই হচ্ছে এমন এক সবজি যার কদর ও বহুবিধ ব্যবহার বাঙালির ঘরে ঘরে। সত্যি বলতে কী, বাঙালি মাছ ছাড়তে পারে, ডাল ছাড়তে পারে কিন্তু আলু ছাড়তে পারে না, পারেনি, পারবেও না। কারণ আলুর সঙ্গে বাঙালি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাছাড়া আলু সুপাচ্য এবং পেট ভরার পক্ষে উপযুক্ত ও অতুলনীয়। যে কোনো বাঙালি শুধুমাত্র আলুর তৈরি যে কোনো পদ-সহ ভাত খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে পারে। তাই আলু বাঙালির কাছে অপরিহার্য।

তবে সমস্যাটা হচ্ছে এইখানে যে এবার আলুর দাম ক্রমবর্ধমান। বিগত বছরগুলিতে এই সময় আলুর দাম এত চড়া ছিল না। গতবারও এই সময় আলুর দাম যত ছিল, এবার সেই আলুর দাম তিনগুণেরও বেশি। এবার আলুর দাম ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে পেতে প্রতি কেজি ১৮ টাকা ছাড়িয়েছে, যা এক রেকর্ড। আর এই মূল্য বৃদ্ধির ঢেউ কোথায় গিয়ে পৌঁছবে তা অজানা। অনেকে বলছেন, আলুর মূল্য বৃদ্ধির কারণ নাকি নির্বাচন। আমরা জানি, আলু নিয়ে রাজনীতি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। চাঁদার জুলুম যে এই মূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ তাও জানি। কিন্তু নির্বাচন তো আগেও হয়েছে বহুবার। কই তখন তো এই হারে মূল্য বৃদ্ধি ঘটেনি। শোনা যাচ্ছে, সরকার নাকি আলুচাষিদের কাছ থেকে আলু কিনছে। তাই দাম বাড়ছে। বেশ তো, তাই যদি হয়, তাহলে নিশ্চয়ই চাষি লাভবান হবে। তবে প্রশ্ন, আলুচাষির আত্মহত্যা বন্ধ হবে তো অতঃপর?

এদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় ও সহজলভ্য সবজি আলুর দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে আমজনতার পকেটে পড়েছে টান। বিত্ত, মধ্যবিত্তের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, যারা নিম্নবিত্ত বা হতদরিদ্র, যারা দু'টাকা কেজি দরে সরকারি চাল পায়, তাদের কাছে আলু কেনার টাকা কোথায়? তাদের কাছে আলু আজ মহার্ঘ। গ্রামে আজও অসংখ্য গরিব মানুষ আছে, যারা দীর্ঘদিন আলুসেদ্ধ-ভাত খেয়ে বেঁচে আছে। আলু কেনার পয়সার অভাবে তারা কী অতঃপর শুধু ভাত খেয়ে বেঁচে থাকবে? সরকারের এ নিয়ে কোনো হেলদোল নেই। তারা নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত, ক্ষমতার লোভে মত্ত। 'বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি' আর কী?

—**ধীরেন দেবনাথ,**
কল্যাণী, নদীয়া।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

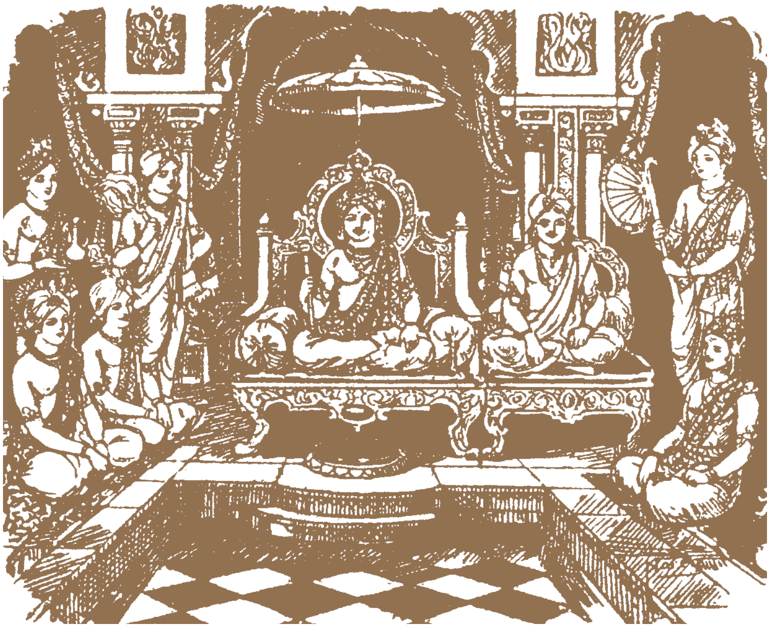

বাংলা নববর্ষ হিন্দুদের, আকবরি নয়

মৃণাল হোড়

বঙ্গাব্দ ১৪২৩। কবে শুরু হয়েছিল তা নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। অন্য ধরনের পণ্ডিতরা বঙ্গাব্দকে আকবরি সন হিসেবে প্রমাণ করতে ব্যস্ত। তাঁদের মতে মোগল শাসক আকবর ৯৬৩ সনের চান্দ্র হিজরিকে ৯৬৩ সৌর হিজরি সনে পরিবর্তিত করার আদেশ জারি করেন যা বঙ্গাব্দ নামে পরিচিতি হয়েছে। এটা সর্বৈব মিথ্যা। প্রকৃত তথ্য বলছে :

প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন আরোহণ-কে স্মরণীয় করতেই গুপ্ত সংবতের সূচনা। সেই কালে গুপ্তাব্দের নববর্ষ ছিল চৈতি পূর্ণিমান্ত : বৈশাখী কৃষ্ণপ্রতিপদে। বৃহৎ বঙ্গে ১লা বৈশাখে নববর্ষের পত্তন হয় সমুদ্র গুপ্ত কর্তৃক বৃহদ্‌বঙ্গ অধিকৃত হলে পরে (অনুমান ৩৩৫—৩৪০ ইংরেজিবর্ষের মধ্যে)। কম-বেশি পৌনে সতেরোশো বছর ধরে চলছে ১লা বৈশাখে বাংলা নববর্ষ। সেই সময়ে গুপ্তাব্দ চান্দ্রমানেই গণনা করা হোত। তাই মাসের নামগুলিও চান্দ্র মাসের নাম। মনে রাখতে হবে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ প্রভৃতি নামগুলি চান্দ্র মাসের— সৌর মাসের নয়। মধু, মাধবী, সহস, সহস্য প্রভৃতি দ্বাদশ নাম সৌর মাসের নাম। ৫৮২ শাকবর্ষের পরে আমাদের দেশে চান্দ্রমানের বদলে সৌর মানে বৎসর গণনা শুরু হয়। এখানে কিন্তু জানতে হবে, চান্দ্র মাস নক্ষত্র ভিত্তিক এবং সৌর মাস রাশি ভিত্তিক। বিশাখা নক্ষত্রে বৈশাখ মাস হলেও সৌর মানে গণনার ফলে মাসটি এখন মেষ রাশিতেই। বাংলা বৎসরে সৌর মাসের নামগুলির ব্যবহার নেই।

অতীতে ১লা বৈশাখে সূর্যোদয়ের পূর্বেই বামাগণ উলুধ্বনি দিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানাত। এখনকার ববছাঁট মার্কা বামাগণ উলু দিতে লজ্জা বোধ করে। তখন সুরা সেবন করে কোমর দুলিয়ে নাচন চলত না। নববর্ষের উৎসব হোত সম্পূর্ণ হিন্দু ঘরানায় পূজার্চনার ভিতর দিয়ে। এই পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ না দিলেও চলবে। কিন্তু প্রশ্ন আসবেই, যদি সমুদ্র গুপ্তই বাংলায় নববর্ষ উৎসবের প্রবর্তক তা হলে বঙ্গাব্দ সংখ্যা ১৪২৩ হয় কোন্ সূত্রে। হ্যাঁ, সূত্র আছে বৈকি?

ঐতিহাসিকদের মতে শ্রীগুপ্ত—চন্দ্র গুপ্তেরা ছিলেন মালদহ কিংবা মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের বাঙালি। তাই গুপ্তাব্দকে মেনে নিতে আম বাঙালির কোনোই অসুবিধা হয়নি। ঠিক ২৭৫ গুপ্তাব্দে গুপ্ত রাজাদের দুর্দশার সুযোগে সামন্ত শশাঙ্ক স্বাধীনতা ঘোষণা করে কর্ণসুবর্ণের সিংহাসনে বসেন এবং নিজ নামে একটি রাজ্যাঙ্কের প্রবর্তন করেন। এটা ইংরেজি বৎসরের হিসাবে ৫৯৪ সাল। তাই ইংরেজি বৎসর থেকে ৫৯৩ বিয়োগ করলেই চলতি বঙ্গাব্দ পাওয়া যায়। ঘটনাটি ঘটেছিল ৫১৫ শাকবর্ষ গতে। এই হেতু ত্রিহুত পদ্ধতিতে বঙ্গাব্দ সংখ্যা পাওয়া যায়। শশাঙ্ক শুধুমাত্র গুপ্তাব্দের সংখ্যা বর্জন করে স্বীয় রাজ্যাঙ্কের প্রবর্তন করেন। তিনি যে সত্য সত্যই রাজ্যাঙ্কের প্রবর্তন করেছিলেন তদ্বিষয়ক পাট্টা (দলিল) পাওয়া গিয়েছে যা মেদিনীপুর লিপি নামে ইদানীং প্রসিদ্ধ। শশাঙ্ক নতুন রাজ্যাঙ্কের প্রবর্তক হলেও নববর্ষের প্রবর্তক তিনি নন। বর্ষ গণনা পূর্ববৎ চান্দ্র মাসেই চলে।

শশাঙ্ক গত হওয়ার কিছু কালের মধ্যেই বৃহদ্‌বঙ্গে মাৎস্যন্যায় শুরু হয়।

অতঃপর শুরু হয় পাল রাজত্ব। পাল রাজারা প্রায় সকলেই নিজ নিজ রাজ্যাঙ্ক ব্যবহার করতেন যার একটিও কালজয়ী হয়নি। এর পরেই আসে সেন রাজাদের আমল। রাজকার্যাদিতে শাকবর্ষের ব্যবহার শুরু হয়, কিন্তু এই শাকবর্ষের নববর্ষে বাঙালির কোনো হেলদোল নেই, থাকবার কথাও নয়। মধ্য রাতে বাজি ফাটিয়ে আকণ্ঠ সুরা সেবন করে কোমর নাচালেই তা উৎসব বলে গণ্য হয় না।

একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, অধুনা কলকাতা হতে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্রগুলি সম্রাট আকবরকে বঙ্গাব্দের প্রবর্তক বলে প্রতি বৎসর প্রচার চালাচ্ছে যা সর্বৈব মিথ্যে মাত্র।

''কহিতে বাঙ্গালাসন মনে বিমর্ষিয়া।
দধিসুত শেষে যুগ চন্দ্রে চন্দ্র দিয়া।।''
—৯১১ বাঙ্গালা সন

বিশ্বকোষ অষ্টাদশ ভাগে প্রকাশিত হেঁয়ালিতে যে কাব্য সমাপ্তির সাল লেখা হয়েছে তাতেই প্রমাণ হয় আকবরের বাপের বাপ তস্য বাপের আমল থেকেই বাংলায় বাংলা বছরের গণনা চলে আসছে। নির্লজ্জ সেকুলাররা যথার্থ সত্যকে আড়াল করছে এবং হিন্দুদের বোঝাতে চাইছে, শোন মশাইরা! বাংলা নববর্ষ উৎসবের ব্যাপারে তোমরা মোল্লাদের কাছে চিরঋণী। অন্য আর এক দল আবার হোসেন শাহকে বাংলা সনের প্রবর্তক বলে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

''আটশয় বিরানইসনে মুলুক দেখিতে।
বাঙ্গলায় বাদশা আইল দিল্লী হৈতে।।''

বিশ্বকোষ অষ্টাদশ ভাগে প্রকাশিত মালাধর বসু তথা গুণরাজ খানের কারিকা থেকে স্পষ্ট হয় যে, হোসেন শাহ বাংলা সনের প্রবর্তক নন। লজ্জাহীন সেকুলার পন্থীরা কিছুতেই সত্যকে মানতে রাজি নয়। অন্যদিকে আকবর যে বঙ্গাব্দের প্রবর্তক সে বিষয়ের পাথুরে প্রমাণও খাড়া করতে রাজি নয়। আসলে আকবর নামা— আইন-ই-আকবরি— আসল-জমা-তুমার ইত্যাদি মোগলাই কিতাবে কোনোই প্রমাণ নেই। প্রমাণ নেই আকবর কর্তৃক প্রচলিত বাংলামুদ্রাতেও।

শাকল ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরাই দুর্গোৎসবে অধিবাসের প্রদীপের ন্যায় বাংলা সনকে রক্ষা করে আসছেন পঞ্জিকাতে। এই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের পৈতৃক ভাষা হচ্ছে ফার্সী। সন ফার্সী শব্দ। শশাঙ্ক সংবৎ পরে সন নামে পরিচিত হয় এবং পরে বাংলা সন বা সন বাংলা বলে পরিচিত হয় পরবর্তীকালে সীতারাম রাজার দানপত্রে বঙ্গাব্দ নামে পরিচিত হতে আমি দেখেছি। বাংলা নববর্ষ উৎসব এবং বর্ষাঙ্ক অবশ্যই হিন্দু কীর্তি, মুসলমানদের সঙ্গে নববর্ষ উৎসবের কোনোই সম্পর্ক নেই। মনে রাখতে হবে, বাংলা নববর্ষ উৎসব আসলে গুপ্তাব্দের নববর্ষ উৎসব। এই দিন কার্পাশ তুলোর পলতে ঘিয়ে ভিজিয়ে কাঁচামাটির প্রদীপ জ্বালাতে হয় এবং নারকেলের খোলায় ধুনো পোড়াতে হয়। মোমবাতি ও আগরবাতি বা ধূপকাঠি একেবারেই নিষিদ্ধ। এই দিন পূর্ববঙ্গে ভগবতী পূজার রেওয়াজ আছে যা ধনলক্ষ্মী উৎসব। গুপ্তদের মুদ্রা বিচার করে অবশ্যই বোঝা যায় যে এটা গুপ্ত যুগেরই সংস্কৃতি। কোনো কোনো ঐতিহাসিক অনুমান করেন, শ্রীগুপ্ত ও চন্দ্রগুপ্ত প্রথমত, বৃহদ্ বঙ্গের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সামন্ত ছিলেন। পরে চন্দ্রগুপ্ত মগধে রাজা হন। এই অনুমান সত্য হলে ১লা বৈশাখে নববর্ষ উৎসব তো প্রায় ১৭০০ বছর ধরে চলছে বলাই যায় না কি? আরও মনে রাখতে হবে, বর্তমানে বাংলা বৎসর সৌরমানে গণনা হলেও আরও একটি বাংলা বছর এর সঙ্গে সঙ্গে চলছে যার নববর্ষ নেই ও অব্দাঙ্ক নেই। এটা অমান্তঃ চান্দ্রবর্ষ। এই অমান্তঃ চান্দ্রমাস ও বৎসরের হিসাবেই রথযাত্রা— দুর্গোৎসব প্রভৃতি হয়। যদি দেখা যায় সৌর আশ্বিনে দুইটি অমান্তঃ চান্দ্রমাসের সংযোগ তা হলে সে বৎসর তেরো মাসে বৎসর এবং চান্দ্র আশ্বিন হবে দুটো। প্রথম চান্দ্র আশ্বিন মলমাস গণ্য হবে এবং দ্বিতীয় চান্দ্র আশ্বিন হবে বিশুদ্ধ মাস। তাই সৌর কার্তিকে দুর্গোৎসব হলেও 'আশ্বিন মাসে শুক্লপক্ষে সপ্তমাংতিথৌ' মন্ত্র পড়তে হয়— কার্তিক মাস উচ্চারণ চলে না। তবে তা যাই হোক, যথার্থ ইতিহাসকে আড়াল করে মিথ্যা কথাগুলিকে প্রচার করা হচ্ছে। কারা করছে এ কাজ? 'তোরা তো আমায় মানিসনে মোল্লা পাড়ায় গেলে। আমার পায়ের ধুলো থাকে না' ঠিক এই মানসিকতায় যারা ভুগছে। মিথ্যা চর্চার কারণে নোবেলজয়ী গড়াগড়ি খাচ্ছে। আমি হিন্দু, আমি আমার সম্পদ হাতছাড়া করতে রাজি নই। ত্রিমস্তক ভারত সরকারকে ইতিহাস ডরায় না। বাংলা নববর্ষ উৎসবকে অর্বাচীনদের হাতে ছেড়ে দিতে রাজি নই। ∎

সবার প্রিয়
বিল্লদা®
চানাচুর

'বিল্লদাকুঞ্জ'

কালিকাপুর, বোলপুর, জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

বৈদিক রমণী

অমিত ঘোষদস্তিদার

‘‘আত্মবেদমগ্র আসীদেক এব, সোহকাময়তাজায়া মে স্যাৎ’’— বৃহদারণ্যকের এই উক্তি (১।৪।৭) আমাদের জানাচ্ছে— পরম আত্মা যিনি সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র অবস্থানরত ছিলেন, তিনিই দৃঢ়তার সঙ্গে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা জানালেন তাঁর জন্য আবশ্যিকভাবে জায়া উৎপন্ন করার। ফলে পরম আত্মার ঔপনিষদিক ওই বাণী নারীজাতির সম্বন্ধে যে মহিমান্বিত জ্ঞান আমাদের সামনে তুলে ধরেছে তাই-ই হলো ‘নারী’ সম্বন্ধীয় ভারতীয় ধারণার চরম দলিল। এই দলিলকে অপারেশন টেবিলে জোর করে শুইয়ে কাটাছেড়া করার অর্থ কদর্য মনের পরিচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

ভারতীয় দর্শনের যে মহাসমুদ্র— সেখানে যতই অবগাহন করা যাবে, তা চিরকালই নারীকে সৃষ্টির সঙ্গে অভিন্নই করে রেখেছে এমনটাই দেখা যাবে। পৃথিবীর কোনো লেখ্যপ্রমাণ ভারতীয় দর্শন-পুরাণ-প্রাক্‌পুরাণ বা বৈদিক ও প্রাক্‌বৈদিক— যে দিক দিয়েই ভাবা হোক না কেন— তাকে বিকৃতার্থক না করে তারা তাদের লেখ্যপ্রমাণ্য নিয়ে এগোতে পারে না, কোনো দিনও পারেনি।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের বিরাটপুরুষ খুবই স্পষ্টভাবে নিজস্ব বৈচিত্র্যজাত উপলব্ধি থেকে এমন এক চরম ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেছেন, যার পবিত্র যাচ্ঞা বা যাচিত ফলই হলো— নারী সত্তার উৎপত্তি।

প্রাচীন ঋষিদের উপলব্ধির স্থায়ীত্বের খননকার্য করার ফলে যে নির্যাস প্রকাশিত হয়, তা হলো ব্যবহারিক জীবন এবং ভাবজগতের সবখানেই নারী চিরন্তন ভাবেই পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার সম্পন্না। এই কথা তাঁরা জগতের সামনে কোনোদিনও কোনোও অবস্থাতেই ঘোষণা করতে কুণ্ঠিতবোধ করেননি। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতা অনেকটা সময় নিয়ে একটা একটা করে ওল্‌টালে বহু তত্ত্বদর্শিনী, ব্রহ্মবিদুষী ও ব্রহ্মবাদিনী নারীর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে জানতে পারার অবকাশ অবশ্যই পাওয়া যায়।

বিশ্ববারা, রোমশা, লোপামুদ্রা, ঘোষা, খনা, অপালা প্রমুখ দিব্যভাব সম্পন্নানারী-ঋষিগণের দৃষ্ট সূক্ত পুরুষ ঋষিদের দৃষ্ট সূক্তর সঙ্গে এক সঙ্গেই সংকলিত হয়ে রয়েছে।

গার্গী, বাচক্লবী, মৈত্রেয়ীর মতো নারীরা আজও শুধু ভারতবর্ষ নয় সমগ্র বিশ্বে গৌরবে, মহিমায়, বিদ্যাবত্তায় সকল বিধিনিষেধের উর্ধ্বে পূজিত হয়ে আসছেন।

ঋগ্বেদে মুদ্‌গলিনী, বিশপলা, বধ্রিমতী, শশীয়সী প্রমুখ যোদ্ধারমণীর কথার উল্লেখ পাওয়া যায়।

বৈদিকশিক্ষা, ললিতকলা, সুতোর সাহায্যে সেলাই করা, পশমের সাহায্যে বোনা, বস্ত্রালংকরণকর্ম, তুলো থেকে সুতো তৈরি, সুতো এবং বস্ত্রাদি রং করা, ঝুড়ি ও রজ্জু তৈরি করা, সুগন্ধি দ্রব্য নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেদ মেয়েদের পারদর্শিতার কথাই জানাচ্ছে।

সঙ্গীত ও নৃত্য উভয়বিধ কলাবিদ্যায় নারী পুরুষ এক সঙ্গেই শিক্ষা নিতেন। শতপথব্রাহ্মণ এবং এক উপাখ্যান মাধ্যমে জানা যায় দেবতারা সঙ্গীত ও নৃত্যকলা সৃষ্টি করে তা সর্বপ্রথম বাগ্‌দেবীকেই শিক্ষা দিয়েছিলেন।

সহমরণ প্রথা বৈদিক যুগে ছিল না, বাল্যবিবাহ প্রচলন ছিল না, বিধবা রমণীদের বেঁচে থাকার কোনো অসুবিধা ছিল না। তবে পতিতাবৃত্তির প্রচলন ছিল এবং তা সমাজে ছিল নিন্দনীয়। কিন্তু অন্যদিকে কুমারীর গর্ভজাত সন্তান আপন কর্ম ও মনীষার দ্বারা সমাজে বিশিষ্ট পদবী লাভ করতে পারতেন এমন দৃষ্টান্ত বৈদিক সাহিত্যে আছে।

‘ব্রহ্মাবাদিনী’, ‘কঠী’, ‘বহ্বচী’, ‘কাশকৃৎস্না’ ইত্যাদি নামে অভিহিত হতেন নারী শিক্ষার্থিনীরা।

ঋক্— সংহিতার দশম মণ্ডলের সূক্তে (১০।৮৫) নববধূ-র উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে—

সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব।
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু।।৬

—তুমি শ্বশুরের উপর প্রভুত্ব কর, শাশুড়িমাতাকে বশ কর, ননদ ও দেবরগণের উপর সম্রাজ্ঞীর ন্যায় হও।

এখানে যে প্রভুত্বের কথা বলা হচ্ছে তা কিন্তু ক্ষমতা বা বল প্রয়োগ অর্থে নয়, বরং স্নেহ-মায়া-মমতাময় এক সম্মানের আবেষ্টনীর মাধ্যমে সংসারকে আলিঙ্গন করে রাখার কথাই বলা হচ্ছে, যা একমাত্র নারীই পারে। এখানে সেই ক্ষমতা প্রয়োগের কথাই উল্লেখিত হয়েছে।

নারী পুরুষের একীকরণ যেমন বৈদিক যুগে এক আদর্শ বলে গণ্য করা হোত, দাম্পত্য সম্পর্কের সুস্থিতি সব কিছুর থেকে বেশি কাম্য বলে মনে করে আজও সমাজে সেই আদর্শই বাহিত হয়ে চলেছে। গৃহিণীরূপে রমণীর অনেক দায়িত্ব আগেও বাহিত হয়েছে এবং আজও তাঁরা বহন করে চলেছেন।

ঋগ্বেদের মন্ত্রে সপত্নীক যজ্ঞ সম্পাদনের বিবরণ পাওয়া যায়। আজও মানুষ সমস্ত কর্মযজ্ঞের সম্পাদন কাজ সপত্নীকই করে থাকেন।

যুগে যুগে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার রিলে রেসে নারীর এক বিশেষ ভূমিকা আছে।

অথর্ববেদ যেমন রমণীদের ব্রহ্মচর্য পালনের কথা উল্লেখ করেছে, ঋগ্বেদও তেমনি বীরাঙ্গনা-যুদ্ধবিদ্যা পটীয়সী রমণীর কথা গর্বের সঙ্গেই ব্যক্ত করেছে। যুগ থেকে যুগে সমাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রমণীদের সেই আদর্শ অটুট থাকাই বাঞ্ছনীয়। ▮

অপু আবিষ্কার

অপুকে নিশ্চয় তোমরা সবাই চেনো। পথের পাঁচালী-র সেই ছোট্ট অপু। যে রেলগাড়ি দেখার জন্য কাশবনের ভিতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। সঙ্গে দিদি দুর্গা। কিংবা গ্রামের মেঠোপথ দিয়ে পাঠশালায় যাওয়া সেই বালক।

এই অপুর আসল নাম সুবীর ব্যানার্জী। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর। অভিনয়ের জন্য এই অপুকে খুঁজে পেতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল পরিচালক সত্যজিৎ রায়কে।

সত্যজিৎ রায়ের প্রথম ছবি পথের পাঁচালী। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বে। সিনেমা তৈরির অনেক কাজের মধ্যে একটি অন্যতম কাজ হলো সঠিক অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচন করা। সত্যজিৎ রায় তাঁর ছবির জন্য বেছে বেছে মনমতো সব অভিনেতা অভিনেত্রীদের খুঁজে বের করলেন। হরিহর, সর্বজয়া, ইন্দির ঠাকরুন, দুর্গা। সবাইকে পাওয়া গেল কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অপুকে নিয়ে। সত্যজিৎ রায় যেরকম অপু চাইছিলেন সেরকম অপু কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে সেদিকে খোঁজ শুরু করলেন। শেষ পর্যন্ত কোথাও না পেয়ে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন। একটি ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে অফিস খুললেন। রোজ অনেক অনেক ছেলে আসতে লাগলো, অডিশন চলল। কিছুতেই মনের মতো পাওয়া যায় না। যে ছেলেরা আসে তাদের কাউকে পছন্দ হয় না। একবার তো এক ভদ্রলোক চুল কাটিয়ে নিজের মেয়েকে ছেলে সাজিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। তাই নিয়ে কি সব কাণ্ড!

এসবের মধ্যে সত্যজিৎ রায় একদিন নীচের ঘরে বসে আছেন। এমন সময় স্ত্রী বিজয়া রায় ছাদ থেকে দৌড়ে নেমে এলেন। বললেন— 'অপুকে পেয়ে গেছি। আমাদের পাশের ছাদে একটি ছেলেকে খেলতে দেখলাম। তুমি শিগগির ওকে ডেকে পাঠাও।'

তারপর আর অপুকে খুঁজতে হয়নি। সেই লাজুক সুবীর ব্যানার্জীকেই অপু চরিত্রে নিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়।

বিরাজ নারায়ণ রায়

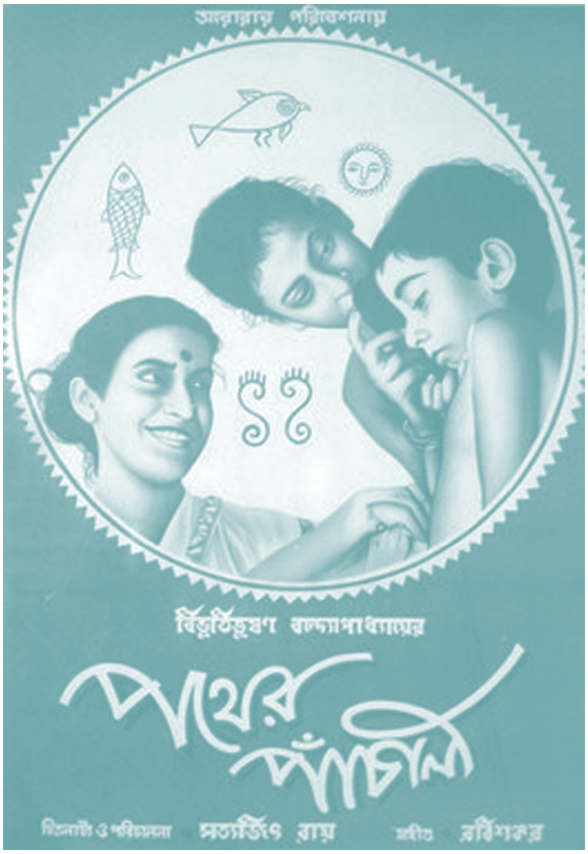

রাজ্য পরিচিতি

হিমাচল প্রদেশ

বন সম্পদে ভরপুর উত্তর ভারতের একটি রাজ্য হিমাচল প্রদেশ। এই রাজ্যের ৩৭ শতাংশ ভূমি বহুমূল্য ঔষধি গাছে আচ্ছাদিত। জ্বালামুখী, নয়নাদেবী, ব্রজেশ্বরী দেবীর মতো শক্তিপীঠ থাকার কারণে তীর্থভূমি হিসেবেও এই রাজ্যের পরিচিতি আছে। মানালির কাছে ভগবান মনুর মন্দির এখনও বর্তমান। কথিত আছে প্রলয় কালে সৃষ্টির বীজ তিনি এখানেই সংরক্ষণ করেছিলেন। পর্যটন কেন্দ্র হিসেবেও এই রাজ্যের খুব খ্যাতি আছে।

হিমাচল প্রদেশের উত্তরে রয়েছে জম্মু-কাশ্মীর। পশ্চিম ও দক্ষিণে পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং পূর্বে উত্তরাখণ্ড। রাজ্যের আয়তন ৫৫ হাজার ৬৬৩ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ৭৭ লক্ষ ২৩ হাজার ১৮৪ জন। রাজধানী সিমলা। ১৯৭১ সালে ২৫ জানুয়ারি এই রাজ্যের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

প্রশ্নবাণ

১. ড. আম্বেদকর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
২. গীতা মহাভারতের কোন্ পর্বের অন্তর্গত?
৩. সুভাষচন্দ্র বসু কত সালে কলকাতায় মেয়র হয়েছিলেন?
৪. জয়ন্তী-পাহাড় কোন্ জেলায় অবস্থিত?
৫. বঙ্কিমচন্দ্রের কোন্ উপন্যাসে মহেন্দ্র চরিত্রটি আছে?

উত্তর : ১. মধ্যপ্রদেশের মহো। ২. ভীষ্ম পর্ব। ৩. ১৯৩০। ৪. আলিপুরদুয়ার। ৫. আনন্দমঠ।

ছবিতে অমিল খোঁজ

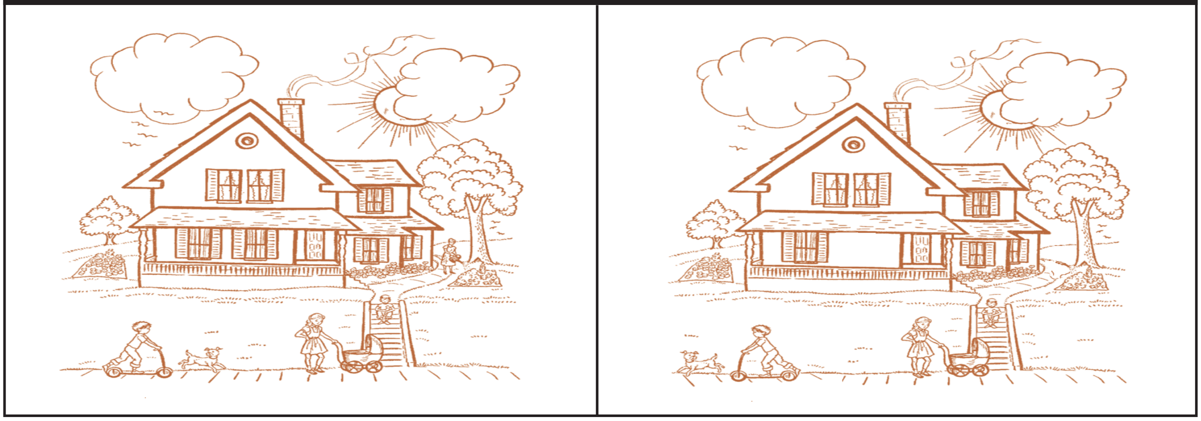

ছোটদের কলমে

চড়ুই পাখি

তপন বসু, চতুর্থ শ্রেণী, হুগলী

ছোট্ট পাখি চড়ুই পাখি
দুষ্টু মিষ্টি বেশ
ঘরের চালে বাসা বাঁধে
সুখের যে নাই শেষ।

কিচিরমিচির সকাল বিকেল
বাড়ি মাথায় করে
ধরতে গেলেই ফুড়ুৎ করে
ওঠে ঘরের চালে।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com

মেল করা যেতে পারে।

লুসাই কন্যা দোয়াতি

রিনি রায়

আমাদের দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল আজও দেশের বেশিরভাগ মানুষের কাছে অনেকটা অজানা। এর একটা বড় কারণ অবশ্য যাতায়াতের অসুবিধা। এই কারণে আত্মিক সংযোগটাও ততটা দৃঢ় হয়ে উঠেনি। অথচ তাদের জীবন-যাপন, ভাব-ভাবনা, আবেগ- অনুভূতি আমাদের মতোই। এরকমই একজন হলেন দোয়াতি।

জংতে ভানলাল দোয়াতি। কুকি-চিন উপজাতির এক অন্যতম শাখা লুসাই পরিবারের মেয়ে। লুসাইরা সাধারণত মিজো নামেই পরিচিত এবং নৃতাত্ত্বিক বিচারে মঙ্গোলয়েড। ত্রিপুরার ভূস্বর্গ জম্পুই পাহাড় প্রধানত এদের আবাসস্থল। একদা এই উপজাতির মানুষেরা ঝুম চাষ এবং বন্য প্রাণী শিকারের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। কিন্তু পরবর্তীকালে এদের মধ্যে শিক্ষার আলো প্রবেশ করে। বর্তমানে এদের মধ্যে শিক্ষার হার ত্রিপুরার অন্যান্য সংখ্যালঘু উপজাতির থেকে বেশ বেশি এবং অনেকেই সরকারি ক্ষেত্রে কর্মরত।

দোয়াতি লুসাই উপজাতির প্রথম মহিলা যিনি ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করে বর্তমানে ঊনকোটি জেলার ডেপুটি কালেক্টরের পদে আসীন। এছাড়াও জেলা প্রশাসনের হেড অফ অফিসেস এবং বিডিও'র দায়িত্বও তাঁকে সামলাতে হয়। ২০০৩ সালের ১ ডিসেম্বর কাঞ্চনপুরে সাবডিভিশনাল ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার অফিসার হিসাবে তাঁর পেশাগত জীবনের পথ চলা শুরু। দীর্ঘ ১২ বছর কালখণ্ডে কর্মক্ষেত্রে তাঁর সহকর্মীরা কখনও তাকে বিরক্ত হতে দেখেননি। বরং হাসিমুখে দক্ষতার সঙ্গে সমস্ত কাজ করেন সবসময়। কাজের প্রতি ভালোবাসা, নিষ্ঠা তাকে সবার থেকে আলাদা করেছে। অত বড় পদে থেকেও সাধারণ মানুষের কথা গুরুত্ব দিয়ে শোনেন ও তার সমাধানের চেষ্টা করেন। তাঁর এই কর্মকুশলতা, নিষ্ঠা ও ভালো ব্যবহারের কারণে ত্রিপুরার জেলাশাসকদের কাছে খুবই নির্ভরযোগ্য নাম দোয়াতি।

জম্পুই পাহাড় সংলগ্ন ভাংমুন পাহাড়ের তিন কিলোমিটার দক্ষিণ বেলিয়ানচিপ গ্রামে

১৯৭৯ সালে ১ জানুয়ারি এই লুসাই কন্যার জন্ম। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত গ্রামের ব্লু মাউন্ট ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশুনা। নবম-দশম মেঘালয়ের জোয়াইয়ের এডভেনটিস্ট স্কুল থেকে পাশ করার পর মিজোরামের রাজধানী আইজলের পাছংগা ইউনিভার্সিটি থেকে বিএসসি ডিগ্রি লাভ। মেধাবী দোয়াতি কাজের সূত্রে শিখে নিয়েছেন বাংলাও। তাঁর কৃতিত্ব লুসাই উপজাতিকে শুধু গৌরবান্বিত নয়, অনুপ্রাণিতও করেছে। তাঁর পথে পা রেখেছেন তাঁর গ্রামের আর এক কন্যা লাল এন ক্লিনি।

কর্মক্ষেত্রের বাইরে গার্হস্থ্য জীবনেও সংসার সামলাতে সমানভাবে পারদর্শী। চাকরি পাওয়ার চার বছর পর আইজলের ডেনটিস্ট ডাঃ লাল লম কিমার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। দুই কন্যা ও এক পুত্রকে নিয়ে ভরা সংসার তাঁর। স্বামী-স্ত্রী মিলে দু'জনেই সংসারের সব দায়িত্ব মিলেমিশে পালন করেন। লুসাইরা মূলত পিতৃতান্ত্রিক হলেও নারীর প্রতি শ্রদ্ধা তাদের অটুট। তাই স্ত্রী যাতে নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারে, সেজন্য তাঁর স্বামী চিকিৎসার পেশা থেকে অবসর নিয়ে সন্তানদের সামলাচ্ছেন। যার ফলে সংসারের জন্য কিম এর আত্মত্যাগ দোয়াতির কেরিয়ার গ্রাফকে উচ্চ থেকে উচ্চতর করেছে। উচ্চপদে থেকেও দোয়াতি তাঁর উপজাতীয় সংস্কৃতি, রন্ধন প্রণালী কিছুমাত্র বিস্মৃত হননি। স্থানীয় পরিচারিকা যেহেতু লুসাই পদ রাঁধতে পারে না, তাই তিনি অফিস সামলেও রান্নাবান্নার দায়িত্ব নিজের হাতে রেখেছেন।

দোয়াতির ক্ষেত্রে তাই বাংলার বহু প্রচলিত প্রবাদবাক্য 'যে রাঁধে, সে চুলও বাঁধে' কথাটি বোধহয় প্রবলভাবে প্রযোজ্য। তিনি তাঁর জনজাতিকে গৌরান্বিত করার পাশাপাশি অনুপ্রাণিতও করেছেন। ■

বিজেপি-র অসম বিজয় একান্ত জরুরি

অতিথি কলম

সুবীর ভৌমিক

একটা আন্তর্জাতিক প্রবাদ আছে জাপানিরা যখন কাঙ্ক্ষিত বস্তুকে অর্জন করতে পারে না অর্থাৎ তারা অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে দূরে থেকে যায় তারা তখন নিজেদের ভাষায় বলে ‘তাকানে নো হানা’। যার বাংলা মানে দাঁড়ায় ওগুলি একান্তই মগডালের ফুল।

এই প্রসঙ্গে, উল্লেখ করা যেতে পারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে ইম্ফলের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ নিয়ে লেখা ওই ‘তাকানে নো হানা’ নামের একটি বই বহুল পঠিত। ওগুলি উঁচু ডালের ফুল, তাই পাড়া সম্ভব নয় এই বাহানায় এড়িয়ে যাওয়ার পথ অসম বিজেপি’র কখনই নেই। পণ্ডিচেরী বাদ দিয়ে চলতি চারটি রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচনে ভারতের কেন্দ্রীয় শাসকদল ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে বাছা-বাছির মতো বিলাসিতা আদৌ নেই। পশ্চিমবঙ্গে তাদের বিশেষ কিছু করে দেখানো যেহেতু সম্ভব নয়, তাই অসমের নির্বাচন তাদের জিততেই হবে। সেখানকার বিধানসভার দখল নেওয়ার ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে। একই সঙ্গে বলা নিষ্প্রয়োজন যে তামিলনাড়ু বা কেরলের যুগ্ম নির্বাচনেও তাদের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা বিবেচিত হচ্ছে না।

> বিজেপি যে অসমের জ্বলন্ত সমস্যা অর্থাৎ বেআইনি অনুপ্রবেশকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়েই সর্বভারতীয় ও প্রাদেশিক ক্ষেত্রে বিচার করছে তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেনে সর্বানন্দের স্বীকৃতি ও তাকে নেতা হিসেবে নির্বাচিত করে ভোটে নেমেছে বিজেপি।

মাস দুয়েক আগে অবধিও একটা বিশ্বাস বেশ দানা পাকাচ্ছিল যে এবার অসমে বিজেপি আসছে। কিন্তু কিছু কিছু মানুষের মধ্যে কেমন যেন একটা ওই প্রাগুক্ত উচ্চ বৃক্ষের ফুল জারিত ধারণা সংক্রামিত হচ্ছে। তবে কি অসম নরেন্দ্র মোদীর ঝুলিতে ঢুকবে না? একটা দোলাচল যেন অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু এখানে বাজি অনেক বড় অঙ্কের। দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাত বোনের ভেতর, এই বোনটিই সর্বার্থেই জ্যেষ্ঠা। রাজ্য হিসেবেও অসম অভিঘাত বাকি ছয় বোন অর্থাৎ নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মণিপুর, মেঘালয়, ত্রিপুরা আর অরুণাচল প্রদেশের ওপর কিছুটা হলেও বর্তানোর সম্ভাবনা তৈরি হয়। বিশেষ করে কেন্দ্রে যদি একই দলের সরকার থাকে।

প্রথমে ২০১৫-র শুরুতে দিল্লী ও শেষের দিকে বিহারে উপর্যুপরি বিধানসভা নির্বাচন দু’টিতে বিজেপি-র যে নির্মম পরাজয় হয় তাকে মুছে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর ২০১৪ সালের দেশব্যাপী জয়ের যে অপ্রতিরোধ্য ধারা তৈরি হয়েছিল সেটি যে অমূলক ছিল না তা প্রমাণ করতে অসম বিজয় একান্ত জরুরি।

এ প্রসঙ্গে বিহারের অভিজ্ঞতা থেকে বিজেপি পর্যাপ্ত শিক্ষা নিয়েছে। তারা নির্বাচনে একজন রাজনৈতিকভাবে শক্তিমান স্থানীয় নেতাকে তুলে ধরেছে। যার ফলে বিহারের মতো দু’নামের মোদীকে নিয়ে কোনো ধন্দ তৈরির অবকাশই নেই।

প্রকৃতপক্ষে সর্বানন্দ সোনোয়াল সুদর্শন, তরুণ ও অত্যন্ত বলিয়ে- কইয়ে একজন লড়াকু নেতা। সবচেয়ে বড় কথা, অসমে বেআইনি অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিতকরণ সম্পর্কিত যে বিতর্কিত আইনটি লাগু ছিল সেই আইএমবিটি অ্যাক্ট ১৯৮৩, সেটিকে প্রায় নিজের একার হাতে সোনোওয়াল আইনি মোকাবিলার মাধ্যমে বাতিল করিয়ে ছেড়েছেন। এই কারণে গরিষ্ঠাংশ অসমীয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বানন্দের এই ‘জাতীয় বীরের’ মর্যাদা রয়েছে। কেননা পূর্বোক্ত আইনটি ছিল বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের অনেকাংশেই অনুকূলে। আরও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো অসমে সর্বানন্দের কখনই উত্তর ভারত থেকে প্রেরিত কোনো আর এস এস প্রচারকের ভাবমূর্তি নেই। কেননা এই ধরনের চাপানো নেতারা অনেক সময়ই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সংস্কৃতির সঙ্গে পুরোপুরি একাত্ম হতে পারেন না। অন্যদিকে সর্বানন্দ অসমের নিজস্ব ভূমিপুত্র হিসেবে সেখানকার অত্যন্ত সংবেদনশীল স্থানীয় রাজনৈতিক পটভূমিতে দীর্ঘ লড়াইয়ের মাধ্যমে নেতৃত্বের শিখরে পৌঁছেছেন। সেই অর্থে বিজেপি যে অসমের জ্বলন্ত সমস্যা অর্থাৎ বেআইনি অনুপ্রবেশকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়েই সর্বভারতীয় ও প্রাদেশিক ক্ষেত্রে বিচার করছে তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেনে সর্বানন্দের স্বীকৃতি ও তাকে নেতা হিসেবে

নির্বাচিত করে ভোটে যাওয়া। সর্বানন্দ এমন এক সদর্থক প্রতীক হিসেবে অসমে গৃহীত হয়েছেন।

এটি যেমন বিজেপি-র পক্ষে একটি বিরাট ইতিবাচক দিক তেমনি ভুলও কিছু কিছু হয়েছে বলে আমার ধারণা। যেমন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ-য়ের একসময়ের ডান হাত হিমন্ত বিশ্বশর্মাকে দলে জায়গা দেওয়া। শর্মা দীর্ঘকাল ধরে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আশা পোষণ করেন। অন্যদিকে তিনি অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের বার্জার ও সারদার মতো বিশাল অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারিতেও জড়িয়ে আছেন। এক্ষেত্রে বিজেপি যেমনটা আন্দাজ করেছিল যে হিমন্ত বিশ্বশর্মা কংগ্রেস ছাড়লে তাঁর পিছু পিছু কংগ্রেসের একটা বড় অংশও বেরিয়ে আসবে সেটা ঘটেনি। এক্ষেত্রে অরুণাচল প্রদেশে যেমন কংগ্রেস ছেড়ে দলকে দল বেরিয়ে এসেছিল তার পুনরাবৃত্তি হয়নি। তাই বিশ্বশর্মার আগমন কাঙ্ক্ষিত ফল দেয়নি।

কিন্তু গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো কংগ্রেস দলে যে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের বাড়বাড়ন্ত এমন একজন মার্কামারা কংগ্রেস নেতাই বিজেপিতে এসে ভিড়ল। শুধু তাই নয়, শর্মার মতো একজন সদা-উচ্চাকাঙ্ক্ষী নেতা কতদিন সোনোওয়ালের নেতৃত্বের আওতায় থাকতে চাইবেন সেটাও বিবেচনার বিষয়। আর এই বৈপরীত্যের একটা ব্যঙ্গাত্মক ছবি সকলেই দেখতে পেয়েছেন বিধানসভার টিকিট বিলির সময়। দীর্ঘদিনের পুরনো বিজেপি কর্মীদের অনেকেই তাঁদের এড়িয়ে দলে নতুন পরিযায়ীদের মনোনয়ন পাওয়ার প্রতিবাদে তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। প্রতিবাদ রাস্তায় নেমে আসে। প্রসঙ্গত এক পুরনো বিজেপি কর্মকর্তা প্রদ্যোত বোরা হিমন্তের দলে আসার প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছেন। বিগত বিধানসভা নির্বাচনে এই বিপুল সম্মাননীয় প্রদ্যোতবাবুকেই বিজেপি তৎকালীন কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বী হিমন্তের বিরুদ্ধে নামিয়েছিল। আমার বিবেচনায় দলের মধ্যে এই অনভিপ্রেত কোন্দলকে বিজেপি অনায়াসে এড়িয়ে যেতে পারত যদি দেশের অন্য অংশের মতো তারা নরেন্দ্র মোদীর বিস্ফোরক ও উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন তীব্র আক্রমণাত্মক বক্তৃতাগুলির ওপরই জোর দিত।

অন্যদিকে কংগ্রেসে থাকাকালীন হিমন্ত বিদেশি অনুপ্রবেশ নিয়ে যে ধরনের বক্তব্য রেখে আসতেন হঠাৎ করে তার সম্পূর্ণ উল্টোসুরে স্ববিরোধী বক্তব্য রাখা শুরু করে দিয়েছিল। বিজেপির পক্ষে আর একটি চিন্তার বিষয় নজরে পড়ছে যেটা হলো হঠাৎ করে বদরুদ্দিন আজমলের নেতৃত্বের এ আই ডি ইউ এফ দলের কেমন মিইয়ে যাওয়া। ২০০৬ সালে প্রথম নির্বাচনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার পর ২০১১ সালের বিধানসভায় এ আই ডি ইউ এফ খুব ভাল করে এক ধাক্কায় তাদের আসন দ্বিগুণ করে ১৭টি কেন্দ্রে জয়লাভ করে। কিন্তু এখন এই আতর কারবারির দলে ভয়ঙ্কর অভ্যন্তরীণ কোন্দল দেখা দিয়েছে। টিকিট না পাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে নিজেদের বহু পার্টি অফিস জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে অনেক দলীয় কর্তাই খোলাখুলি কংগ্রেসের পক্ষে প্রচার করছেন।

পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করলে এটি একটি ভয়ঙ্কর প্রবণতা। রাজ্যের ৩৫ শতাংশ মুসলমান ভোট যদি আবার কংগ্রেসের দিকে ফিরে যায়? আজমল এর ফলে হয়ত ধুয়ে মুছে যাবে কিন্তু কংগ্রেস তো নিজ মূর্তি ধারণ করবে। এর মধ্যে আজমল নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছে টাকা কামানোর ধান্দায় গিয়ে। শোনা যাচ্ছে, সে সর্বোচ্চ নিলামে দলের টিকিট বিক্রি করেছে। অন্যদিকে সময় সময় মোদীর কাজের প্রশংসাও আফজলের মুখে শোনা গেছে। ফলে একটা ধারণা দানা পাকাচ্ছে যে আজমল যার সঙ্গে আবার হিমন্তের যথেষ্ট মাখামাখি রয়েছে তার মাধ্যমেই নিজ দলকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করছে যেটি আদতে মোদী-অমিত শাহেরই পরিকল্পনা। ভাবনার বিষয় হচ্ছে, বিজেপি বেআইনি অনুপ্রবেশ নিয়ে যত ঝাঁঝালো হবে, মুসলমানরা ততই অসুরক্ষিত বোধ করবে। আর এই অবস্থায় আজমলের দল টলমল করলে নিরাপত্তার খোঁজে মুসলমানরা কংগ্রেসের দিকেই ঝুঁকতে পারে। কিন্তু ভোট বিশারদ ও ঘোলা জলে মাছ ধরতে ওস্তাদ হিমন্তের কারিকুরি কতদূর এই পরিস্থিতি ঠেকাতে পারবে তা বলা শক্ত। কেননা হেমন্ত শর্মার নিজের ভাবমূর্তিই তো বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়।

এই পরিস্থিতিতে অসম অনিশ্চিত হয়ে পড়লে বিজেপির হতাশার কারণ অবশ্যই ঘটবে। কেননা পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস-বামজোট তৈরি হয়ে ভোটের পোলারাইজেশন পুরোপুরি হয়েছে। যেখানে বিজেপি আদৌ সুবিধেজনক জায়গায় নেই। ২০১৪-র লোকসভায় প্রাপ্ত ১৭ শতাংশ ভোটের অনেকাংশই ইতিমধ্যে উৎসমুখে ফিরে গেছে। সেই অর্থে বিজেপির কোনো ঘোষিত নেতাই এখানে নেই। সেই দিক থেকে বিহারের পর একজন যথার্থ নেতাকে অসমে সামনে এনে বিজেপি যেমন সঠিক কাজটি করেছে, কিন্তু বিতর্কিত হিমন্তকে ঢুকিয়ে তার বেশ কিছু সুফল তারা খোয়াতে পারে।

যেহেতু আমাদের গুরুত্বের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির হারাবার তেমন কিছু নেই। তারা লোকসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ ও বিধ্বংসী গরিষ্ঠতা পেয়ে কেন্দ্রে মমতা ব্যানার্জীর লাঠি ঘোরানো বন্ধ করে দিয়েছে, সেরকম এই বিধানসভায় কালীঘাটের মন্দিরে তাদের একটাই প্রার্থনা হতে পারে মমতা জিতুক, কিন্তু নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা থেকে একটু দূরে থাকুক। বিজেপি যদি দু' অঙ্কের কিছু বেশি আসন পায় তাহলে অগ্নিকন্যাকে হাত পাততে হতে পারে। সেক্ষেত্রে তারাই হতে পারে কিং মেকার। ■

ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ

তত্ত্বকথার আড়ালে লালবাবারা আমাদের মা-কে গালি দিচ্ছে

প্রবাল চক্রবর্তী

বামপন্থীরা মা দুর্গা সম্বন্ধে কীসব নোংরা কথাবার্তা বলে বেড়ায়, সেসব ভারতের সংসদে ফাঁস করে দিয়েছেন স্মৃতি ইরানি। বাঙালির বিরাট উপকার করেছেন। এবার সরাসরি ফয়সালার সময় এসেছে। এদিকে আমি কমিউনিস্ট, ওদিকে আমি পাড়ার পুজোর উদ্যোক্তা, ঘণ্টা নেড়ে পুরুতগিরিও করি— এসব ধোঁকাদারি আর চলবে না। পরিষ্কার বলতে হবে, তুমি কোনদিকে আছো। যাঁরা এখনো বামেদের প্রতি দুর্বল, তাঁদেরও ভাববার সময় এসেছে, কোন নোংরামির অংশীদার করছেন তাঁরা নিজেদের।

এরা এমন একটা জায়গায় ঘা দিয়েছে, যেটা বাঙালির অস্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। হিমালয় থেকে গঙ্গাসাগর, চন্দ্রকেতুগড় থেকে পাণ্ডুরাজার ঢিপি, সর্বত্রই ‘কমন’ হলো মাতৃ-উপাসনার পরম্পরা। সাংখ্যদর্শন বাঙালির নিজস্ব দর্শন, অনেক হাজার বছর আগে গঙ্গাসাগরে বসে কপিলমুনি যা লিখেছিলেন। সাংখ্যর ‘প্রকৃতি’ই বাঙালির প্রাণের মা। বাঙালি যখন বজ্রযানী বৌদ্ধ ছিল, তিনি ছিলেন দেবী তারা। বাঙালি শাক্ত হয়েছে তিনি হয়েছেন মা কালী। বাঙালি বৈষ্ণব হয়েছে, তিনি হয়েছেন শ্রীরাধা। বাঙালি আউল বাউল সহজিয়া মরমিয়া হয়েছে মাতৃসাধনাকে আঁকড়ে ধরেই। মায়ের ভালোবাসায় বুলেট বুকে নিয়েছে হাসতে হাসতে, কালাপানির দ্বীপান্তর সয়েছে গান গাইতে গাইতে। দেশটাকে একা হাতে স্বাধীন করেছে বন্দেমাতরম্ হুঙ্কারে। বাঙালি যে দেশে গেছে, সে আইসল্যান্ড হোক কি অস্ট্রেলিয়া, সেখানেই মাতৃপূজার পরম্পরা শুরু করেছে। শত মন্বন্তরেও বাঙালি মা-কে ছাড়েনি। বাম-জেহাদিদের এটা মনে রাখা দরকার। আমরা জন্ম থেকেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত। মাকে ধরে টান দিয়েছো, বাঙালি তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে ছাড়বে।

একটা অকল্পনীয় নোংরা অপবাদ এরা দিয়ে বেড়াচ্ছে মা দুর্গার সম্বন্ধে, একটাই ব্যাপারকে ভিত্তি করে। মা দুর্গার মূর্তি গড়তে বেশ্যাদ্বারের মাটি লাগে। মূর্খরা পড়ে দেখেনি, যেখানে এই কথাটা লেখা আছে, সেখানে এটাও লেখা আছে, মায়ের মূর্তিতে আরো ন’রকমের মাটি লাগে। হাতির দাঁতের মাটি, শুয়োরের দাঁতের মাটি, পিঁপড়ের ঢিবির মাটি, চৌরাস্তার মাটি, প্রাসাদের মাটি, পাহাড়ের মাটি, নদীর মাটি ইত্যাদি। মায়ের মূর্তির মাটির উৎস একটা প্রতীকী ব্যাপার। মাতৃরূপ ‘ইনক্লুসিভিটি’র প্রতীক। মা সবার মা, বিশেষত অবহেলিত ঘৃণিত অন্তজদের। তাই তাঁর মৃন্ময়ী রূপে সবার অংশ সম্মিলিত হয়, বিশেষ করে অবহেলিতদের।

ভুলে ভরা মার্কসবাদ ছেড়ে এখন লালুদারা আশ্রয় নিয়েছে আরো বড়রকমের ভুলে ভরা এক থিওরিতে। এ যেন ফ্রাইং প্যান টু ফায়ার। ...থিওরি এরা যাই কপচাক, আদতে এরা আমাদের মা-কে গালি দিয়েছে। সেটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

মুশকিল হয়েছে কি জানেন? কমিউনিজমের তত্ত্বকথা অনেককাল ধরেই পাবলিক আর খাচ্ছে না। তাই ওদের এসব পাগলামোতে ধরেছে। কথায় বলে, ফলেন পরিচয়তে। দেশে দেশে কমিউনিস্ট বিষবৃক্ষে যেসব উৎকৃষ্ট ফল ধরেছে, তা দেখে কারই বা বিশ্বাস অটুট থাকে? কমিউনিজমে আকৃষ্ট হয়ে কমিউনিস্ট হওয়া লোকের সংখ্যা ক্রমশই কমছিল। সেই পরিসর দখল করে নিচ্ছিল ইট-চুন-সুরকির ক্যাডাররা। তাদের জোরেই আরো কিছুকাল ‘মার্ক্সবাদ সর্বশক্তিমান’ হুঙ্কারে গা-জোয়ারি করে কাটিয়ে দিল। লোকে ভাবতো, পক্ষীরাজ যদি, তবে ন্যাজ নাই কেন? ভয়ে বলত না। রাজার পার্টি বলে কতা, এমনিতেই হাতে মাথা কাটে। কমিউনিস্টদের শেষ আশ্রয় ছিল এই খণ্ডিত বাংলা। জগদ্দল পাথরের মতো বুকে চেপে বসেছিল বাঙালির শ্বাসরোধ করে। হঠাৎ একদিন ‘কোথা হইতে কি হইয়া গেল’, দেখি সেখানেও স্থানচ্যুত। লালবাবাদের এখন রিফিউজি দশা। ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই, বড় দুঃখে

কাটে দিন। না হে, বড়ই অবিচার হচ্ছে। ওদের একটা থাকার জায়গা তো চাই? একটা রিহ্যাবিলিটেশন প্যাকেজ কি কেউ দেবে না?

রিহ্যাবিলিটেশন প্যাকেজের একটা গল্প বলি, শুনুন। অর্জুনের নাতি পরীক্ষিৎ তখন ভারতসম্রাট। খবর এল, কলিযুগ আসছে। পরীক্ষিৎ বললেন, আমার জীবদ্দশায় কলিকে ঢুকতে দেব না। শুনে কলি হাতজোড় করে এসে বলল, মহারাজ, শরণার্থীকে আশ্রয়দান রাজার কর্তব্য। আমাকে একটা থাকার জায়গা দিন। কর্তব্যের কথা শুনে পরীক্ষিৎ পড়লেন ফাঁপরে। বললেন, কোথায় থাকতে চাও? কলি মিনমিন করে বলল, মহারাজ, আমি স্বর্ণধাতুর মধ্যে থাকতে চাই। পরীক্ষিৎ ভেবেচিন্তে দেখলেন, সোনার ব্যবহার তো শুধু অলঙ্কারে। অস্ত্রশস্ত্র বা যন্ত্রপাতিতে সোনা লাগে না। তা, থাকুক তবে সোনার মধ্যে। বললেন, তথাস্তু! অমনি কলি সুড়ুৎ করে সোনার মধ্যে গিয়ে অধিষ্ঠান করল। পরীক্ষিৎ খেয়াল করেননি, ওঁর নিজের রাজমুকুটটাই সোনার তৈরি। এরপর যেই না পরীক্ষিৎ তাঁর মুকুটটি মাথায় চড়ালেন, কলি পরীক্ষিতের মাথায় ভর করল। তাঁকে দিয়ে একের পর এক ভুলভাল কাজ করিয়ে নিজের প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করে ফেললো।

কলিযুগে লালবাবাদের অন্তিম আশ্রয় ভারতের কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে মৌরসিপাট্টা গেড়ে বসে খোকাবাবুরা পরিকল্পনা করছে, কি করে প্রত্যাবর্তন করা যায়। ছাত্রছাত্রীদের মাথায় ভর করছে, তাদের চাঁদিতে কাঁঠাল ভেঙে তাদের দিয়ে ইচ্ছেমতো কাজ করাচ্ছে। এসব কাজের মধ্যে দিয়েই একদিন ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করবে, এমনটাই স্বপ্ন। কিন্তু মুশকিল ওই, কমিউনিজমের তত্ত্বকথা পাবলিকের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরাও আর খাচ্ছে না। তাই সেই তত্ত্বকথার সঙ্গে কিছু অন্য মালমশলা মেশানো জরুরি হয়ে পড়েছিল। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, সেই মশলা মেশানো সম্পূর্ণ হয়েছে। কি নেই সেই ককটেলে। মার্কসবাদ, ম্যাওবাদ, রাক্কস-খোক্কস-দত্যি-দানো, গুয়েভরা, মহিষাসুর, শূর্পনখা, সাবস্ট্যান্স অ্যাবিউজ, জাতপাত, হাঁচি-কাশি-টিকটিকি, কন্সপিরেসি থিওরি, ইহুদি-বিদ্বেষ, সশস্ত্র জেহাদ, প্যালেস্টাইন, মালদা, খাগড়াগড়— সব আছে। অতি উমদা সে আরক সেবনে অবোধ বালক তুরীয়ানন্দ প্রাপ্ত হয়। নেশার ঝোঁকে নিজের ডাল নিজেই কাটে। যেদিন নেশার ঘোর কাটবে, কেঁদেও কূল পাবে না এই ছাত্রছাত্রীরা।

অস্ট্রেলিয়ায় দেখেছি, স্কুলশিক্ষা সরকারি ভরতুকিতে চলে। পাশ করে অধিকাংশই পেশাগত শিক্ষায় যায়, সেখানেও ভরতুকি মেলে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতুকি ছিটেফোঁটা মাত্র। শুধুমাত্র সিরিয়াস ছাত্রছাত্রীরাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকে। তারা পকেটের কড়ি ফেলে লেখাপড়া করে। খরচ যোগাতে ব্যাঙ্ক থেকে ধার করে, পার্টটাইম চাকরি করে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, ভারতেও এই ব্যবস্থা চালু হওয়া দরকার। গ্যাঁটের পয়সায় লেখাপড়া করলে দায়িত্বজ্ঞান আসবে, ভুলভাল আন্দোলনে জড়িয়ে পড়বে না। কিছু সুবিধাভোগী বখাটে ছাত্রছাত্রী গরিব দেশের গরিব জনতার রক্ত-জল-করা টাকা ধ্বংস করে দেশেরই পিঠে ছুরি মারছে। সরকারি স্টাইপেন্ডের টাকা উড়িয়ে ভালো ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করছে। এটা বন্ধ হওয়া দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের হারামের মধু শুকিয়ে গেলে জব্দ হবে লালবাবারা।

চীনা কমিউনিস্টরা আজকাল কনফুসিয়াসের দর্শন পড়ছে। সেখানকার কমিউনিস্ট চিন্তানায়ক ওয়াং জেই সেমিনার আয়োজন করে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকর্তাদের শেখাচ্ছেন, কনফুসিয়াসের দর্শন কীভাবে সমাজবাদকে সঠিক রাস্তা দেখাতে পারে। চীনের প্রেসিডেন্ট জি জিনপিংয়ের ভবিষ্যতের চীনের কল্পনার বিরাট অংশই জুড়ে আছে কনফুসিয়াসের দর্শন। এর পাশাপাশি দেশি কমিউনিস্টদের দেখুন। কোনোদিনও গীতা উল্টে দেখেছে? মানছি, তারা নিরীশ্বরবাদী, গীতায় তাই অ্যালার্জি। কিন্তু সাংখ্য? জৈন? এগুলো তো নিরীশ্বরবাদী মতবাদ। তবু দেশি লালবাবারা এসবের চর্চা করেনি কোনোদিন। এদের লেখাপড়ার সবটাই পাশ্চাত্য-ঘেঁষা। হেগেল আর মার্ক্সের চোখ দিয়ে ভারতবর্ষকে দেখতো। তবুও, এককালে ওরা লেখাপড়া করত একটু- আধটু। আজকাল সেসবও চুকেবুকে গেছে। নাহলে এরকম উদ্ভট থিওরি খাড়া করে?

কার্ল মার্কস বলেছিলেন, মানবসমাজ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। হ্যাভস (বড়লোক) ও হ্যাভনটস (গরিব)। এই দুই শ্রেণীর লড়াই বাধাতে হবে। সেই লড়াইয়ে হ্যাভনটসদের পক্ষ নিয়ে দেশের শাসনক্ষমতা দখল করতে হবে কমিউনিস্টদের। বাস্তবে দেখা গেল, ব্যাপারটা অতটা সাদাকালো নয়। হ্যাভস আর হ্যাভনটসদের মাঝখানে অসংখ্য মধ্যবর্তী শ্রেণী রয়েছে। রয়েছে ভামাশাহর মতো বড়লোক, যারা দেশের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে স্বেচ্ছায় গরিব হয়ে যায়। রয়েছে ধাওতাল সাহুর মতো মহাজন, যারা গরিব খাতকদের টাকা ধার দিয়ে ভুলে যায়। উল্টোদিকে এমন গরিব মানুষদেরও দেখা মেলে, যারা গরিবেরই রক্ত শুষে বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখে। কার্ল মার্কস ভেবেছিলেন, মানুষ একটি আর্থিক জন্তু, অর্থনীতির দাস। আর্থিক পরিস্থিতি ছাড়া আর কোনো পরিচয় নেই তার। বাস্তবে দেখা গেল, আর্থিক পরিস্থিতিই সব পরিচয় নয়। একজন শিক্ষক বা সাহিত্যিক গরিব হয়েও একজন স্বার্থপর বড়লোকের থেকে অনেক বেশি সম্মান পায় সমাজে। ভারতবর্ষে এটা অহরহই ঘটে। মার্কসবাদের শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বে তাই গোড়ায় গলদ। অনেক চেষ্টা করেও তাই হ্যাভস-হ্যাভনটসের লড়াই বাঁধানো গেল না ভারতে। কিন্তু এই দ্বন্দ্বই তো মার্কসবাদের ভিত্তিপ্রস্তর। কি করা যায় তবে? তাই মার্কসবাদের সঙ্গে গাঁজাখুরি আর্য আক্রমণ তত্ত্ব আর বিকৃত জাতপাতপ্রথাকে মিশিয়ে শ্রেণীসংগ্রামের এক নবরূপ তৈরি হয়েছে। কি সেই নবরূপ? গরিবরা হলো নীচুজাত, তারা অনার্য কৃষ্ণাঙ্গ, এদেশের আদিম নিবাসী। তাদেরকে অসুর, দৈত্য বা দানব বলা হোত এককালে। আর্যরা তাদেরকে খেদিয়ে দিয়েছিল, তাই আজ তাদের নিবাস

দক্ষিণ ভারতে। তারা বেদবিরোধী। এদের বিরুদ্ধে আছে বড়লোকেরা। তারা উঁচুজাত, তারাই বহিরাগত আর্য। এদের মূল নিবাস এখন উত্তর ভারত। এরা শ্বেতাঙ্গ, এরা এককালে নিজেদেরকে দেবতা বলত, এরা বেদ মানে। এই উদ্ভট সমীকরণ শুনে বলতে ইচ্ছে করে, আর কইয়েন না কত্তা, ঘোড়ায় হাসবো। বস্তুত, একটা মজার খেলা হতে পারে— এই থিওরিতে ক'টা স্ববিরোধিতা আছে, সেটা খুঁজে বার করতে হবে। সময় পাঁচ মিনিট। যে বেশি সংখ্যায় স্ববিরোধিতা খুঁজে বার করতে পারবে, জিত তার।

স্ববিরোধিতায় গুলি মারো। পিঠে বেঁধেছি কুলো, কানে দিয়েছি তুলো। বামজেহাদি ছানাপোনাদের নতুন মন্ত্র 'কাস্ট কনফ্লিক্ট ইজ ক্লাস কনফ্লিক্ট'। জাতিদাঙ্গাই বিপ্লবের সোপান। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক! সংগ্রামের সঙ্গী হয়েছে জাতপাতবাদী আর জেহাদিরা। ইচ্ছে, সবাই মিলে ভারতীয় সমাজকে, ভারতবর্ষ দেশটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। কমরেড, এলোমেলো না করলে লুটেপুটে নেবেন কেমন করে? লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই। লড়াই না থাকলে লড়াই বাধাতে চাই। তাই লাল সেলাম সংগ্রামের সঙ্গী কমরেড দাউদ ইব্রাহিমকে। বিপ্লবী অভিনন্দন কমরেড হাফিজ সইদ আর তাঁর পোষা হুলোদের। লালবাবারা সাতচল্লিশে পাকিস্তানের আজাদি চেয়েছিল। এখন তেনাদের কাশ্মীরের আজাদি চাই। চাইলেই হলো! কাশ্যপ-মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা যদি ওঠে, তবে প্রতিটি কাশ্যপ- গোত্রের নাগরিকের ভোট নিতে হবে। উত্তরাধিকার আইন তো তাই বলে। এইরে, কাশ্মীর উপত্যকার আজকের যারা অধিবাসী, তাদের অধিকাংশই তো তাদের কাশ্যপ-গোত্রের উত্তরাধিকার ভুলে গেছে! তাদের কী হবে? কেউ যদি পিতৃপরিচয় ত্যাগ করে, বাবার সম্পত্তিতে কি তার অধিকার থাকে? তাছাড়া, কাশ্মীর কারোর বাবার সম্পত্তি নয়, দেশমাতৃকার অঙ্গ। স্বয়ং রাষ্ট্রপতিরও অধিকার নেই দেশমাতার অঙ্গচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেবার।

একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করছি। আগে লেলোবাবুরা বলত, বাংলাভাষা মাতৃদুগ্ধ। আগমার্কা বাঙালি সেজে হিন্দি-বিরোধিতাই ছিল ওদের প্রধান মোডাস অপারেন্ডি। আজকাল দেখছি, উর্দু-হিন্দি স্লোগানই ওদের বেশি পছন্দ। কেন, টার্গেট অডিয়েন্স বদলে গেছে বুঝি? বাংলা-বাঙালি জিগির তবে কি শুধু লোক-দেখানো ধোঁকার টাটি ছিল? আরেকটা পরিবর্তন দেখছি। আগে লালবাবাদের পেটেন্ট গালাগালি ছিল 'বুর্জোয়া'। এখন সেটা মনুবাদী, আর্যবাদী, ব্রাহ্মণ্যবাদী। লেখাপড়া ছেড়ে দিলে এটাই হয়। গালাগালিগুলোও জুৎসই হয় না। মনু তো সুদূর দক্ষিণের কাঞ্চীপুরমে জন্মেছিলেন। তিনি কবে বহিরাগত আর্য হলেন? তিনি আইন-প্রণেতা, এজন্য শ্রদ্ধার্হ্য। কিন্তু মনুস্মৃতির মূল্য আজ ততটাই, যতটা গুপ্ত বা মোগল আমলের আইন-সংহিতার। আজ হিন্দুরা আম্বেদকর-সংহিতা মানে, মনু-সংহিতা নয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, আমি গুণকর্মের ভিত্তিতে চতুর্বর্ণের সৃষ্টি করেছি। জন্ম নয়, গুণ ও কর্ম। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং জন্মগত জাতিভেদের বিরুদ্ধে ছিলেন। 'গুণকর্ম'র নিয়ম মানলে ব্যাপারটা কিরকম দাঁড়ায়? আমার বাবা ছিলেন ব্যবসায়ী, এক কাকা ডাক্তার। আমি সরকারি চাকুরে, স্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরতা, বোন মাল্টিন্যাশানালে। তার মানে, বাবা বৈশ্য, কাকা বৈদ্য, আমি কায়স্থ, গিন্নি ব্রাহ্মণ, বোন শূদ্র, তাই না? এর মধ্যে কে উঁচু কে নীচু? বাংলায় নমঃশূদ্র সম্প্রদায়কে অন্ত্যজ বলা হোত। অথচ পালরাজত্বে এঁরাই ছিলেন সর্বক্ষেত্রে আগুয়ান। সেনরাজারা তাঁদের 'চণ্ডাল' আখ্যা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল, পালদের অনুগত কাউকে গুরুত্বপূর্ণ পদে রাখবে না বলে। আজ যে সমাজপতি, কাল সে অন্ত্যজ অধিকাংশ 'নীচুজাত' এর পেছনে এরকমই কাহিনি রয়েছে। এটা রাজনীতির দোষ, ধর্মের নয়।

বজ্রয়ান-সহজযান, চৈতন্যদেব, আউল-বাউল, ব্রাহ্মসমাজ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সব মিলেমিশে বাঙালির ব্যবহারিক জীবনে জাতপাতের ভূমিকা হয়েছে অপ্রাসঙ্গিক। প্রেমবিবাহে তো বটেই, আজকাল সম্বন্ধ-বিবাহেও জাতপাত দেখার চল উঠে যাচ্ছে। বন্ধুদের মধ্যে কে কি জাত, খেয়াল রাখাটাই অসম্ভব। দল বেঁধে সবাই চড়ুইভাতি করছে, হিল্লিদিল্লি বেড়াতে যাচ্ছে, কেউ মানে না জাতের বজ্জাতি। বস্তুত, যারা এখনো জাতপাত মানে, তাদের পাগল মেনে চাঁদিতে একটা চাঁটি লাগানো কর্তব্য। বাঙালি কিন্তু সেই প্রগতিশীলতা থেকেই এককালে কমিউনিজমে আকৃষ্ট হয়েছিল। কি উল্টো গেরো, আজ কমিউনিস্টরাই বাংলায় জাতিদাঙ্গার চেষ্টা করছে। মৌলালির মোড়ে গিটার বাজিয়ে মহিষাসুরের বদলা চাইছে। আমার এক বন্ধু, জাতে কায়েত, বন্ধুপত্নী নমঃশুভ্র, ইন্ডিয়ায় বেড়াতে যাচ্ছে। বললাম, 'সাবধানে থাকিস। ভুলেও দাম্পত্য-কলহ নয়। সেটাকেও না কমরেডরা মনুবাদী আর্য আক্রমণ আর শূর্পনখার ক্লাস স্ট্রাগল বলে চালিয়ে দেয়।' বন্ধুপত্নী রেগে কাঁই, 'আমি শূর্পনখা?' বললাম, 'সখী, তুমি আদ্যাশক্তি মহামায়া। আরেকবার অসুরগুলোকে বেশ করে ঠ্যাঙাও দিকি।' হেগেল আর মার্কস ছেড়ে দেশি ভামদের এখন আশ্রয় হয়েছে ক্র্যাকপট ঐতিহাসিকদের ভুয়ো থিওরিতে। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন নয়, এদের থিওরির ভিত্তি— আর্য বহিরাক্রমণ তত্ত্ব। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো থিওরি বোধহয় এত মিথ্যে আর গোঁজামিলে ভরা নয়, যেরকমটা আর্য বহিরাক্রমণ তত্ত্ব। সে বিষয়ে আরেকদিন কথা বলা যাবে। মজার ব্যাপার হলো, ভুলে ভরা মার্কসবাদ ছেড়ে এখন লালুদারা আশ্রয় নিয়েছে আরো বড়রকমের ভুলে ভরা এক থিওরিতে। এ যেন ফ্রাইং প্যান টু ফায়ার। এদের যে কি গতি হবে, তা মহাকালই জানেন। তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার। থিওরি এরা যাই কপচাক, আদতে এরা আমাদের মা-কে গালি দিয়েছে। সেটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। যারা আমাদের মায়ের নামে কলঙ্ক রটাচ্ছে, তাদের যদি আমরা সহ্য করি, তবে নিশ্চিতভাবে আমরা আমাদের মায়ের ব্যাটা নই! ধিক্ তবে আমাদের অস্তিত্বে।

(লেখক মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী ভারতীয়)

জাতীয়তাবোধ এবং তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা

সঞ্জীব বাগচী

সম্প্রতি দেশের মাটিতে বিতর্ক উঠেছে জাতীয়তাবোধ এবং দেশপ্রেম নিয়ে। কিছু তথাকথিত বিদগ্ধ মানুষও বলছেন জাতীয়তাবোধের দরকার নেই, এটি একটি পুরনো ব্যাকডেটেড বিষয়। তার মধ্যে একজন নোবেলজয়ী অধ্যাপকও আছেন। খুব ভালো কথা জাতীয়তাবোধ একটু পুরনো বস্তাপচা বিষয় এটা মেনে নিয়েই আমি তাদের প্রতি সম্মানের সঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন করছি। (১) জাতীয়তাবোধ কাকে বলে? তার সংজ্ঞাটি দেবেন কি? (২) দেশপ্রেম জিনিসটা কী? তার ভিত্তিটাইবা কী? (৩) যেসব মানুষেরা বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন বিপ্লবী সঙ্ঘের পরিচালনায় কিংবা গান্ধীজী, নেতাজীর হাত ধরে তাঁরা কিসের উদ্দীপনায় একাজ করেছিলেন? নেতাজী বলেছিলেন, তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। এর অনুপ্রেরণা কী ছিল? এখন এই জাতীয়তাবোধ ব্যাপারটা কি এর একটু বিশদে যাওয়ার দরকার। সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিটি এলাকা বা দেশ গঠিত হয়েছে সেই অঞ্চলের মানুষদের নিয়ে। সেই মানুষেরা শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতি, বর্ণে, দেহজ গঠনে মানসিকতায় প্রায় এক। তাদের নিয়ে গঠিত হয়েছে একটি জাত। আবার সেই জাত বা অনেক ক'টি জাত নিয়ে গঠিত হয়েছে একটি দেশ। সৃষ্টিগত কারণে আমাদের প্রত্যেকেরই একটি অহং আছে। তেমনি সমস্ত জাতি বা গোষ্ঠীরই শৌর্য, বীর্য, বুদ্ধি, বল সম্পত্তি নিয়ে একটি গরিমা আছে। যা নিয়ে তারা অন্যের সঙ্গে নিজের তুলনা টানে। আর এর ফলেই গঠিত হয় জাতির প্রতি ভালোবাসা আর এইটাই জাতীয়তাবোধ। তেমনই সেইসব জাত যে অঞ্চলে বাস করে সেটা তার দেশ। সেই দেশের মাটিতে তার জল হাওয়া, সেখানে উদ্ভুত খাদ্য, বস্ত্র, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে সে বেড়ে ওঠে। ফলে সেই অঞ্চলের প্রতি একটা টান বা মায়া সে অনুভব করে আর সেইটাই দেশপ্রেম। তেমনি ভারতবর্ষের জলহাওয়ায় পুষ্ট আমরা নিজেদের ভারতীয় ভাবি এবং ভারতবর্ষকে আমরা মা মনে করি। বিদগ্ধদের যদি এ প্রশ্নও করা হয় যে এই যে ভারত, সে নাম এল কোত্থেকে? কারাই বা দিল? সে ভাষাটাও কি আমাদের নয়? বিদগ্ধরা রে রে করে বলে উঠবেন কে বলেছে এটা ভারত, এটা ইন্ডিয়া। এরা অবশ্য এই ভাবেই বিচার করেন কারণ, তাদের সবটাই বিদেশি অন্নে পুষ্ট, তারা স্বদেশের ঠাকুর ছেড়ে বিদেশের কুকুর ধরতে ব্যস্ত।

এখন এই ময়ূরপুচ্ছ কাকেরা দেশপ্রেমের আর জাতীয়তাবোধের কী বুঝবেন। তারা অবশ্য নিজেদের সমর্থনে বিশ্বকবিকে ডেকে আনছেন। তা আমি বেশি কথায় যাব না অতুল প্রসাদ সেনের গান উল্লেখ করে তা রচনার সময়কালটা ধরে জিজ্ঞাসা করব এই গানটা কিসের অনুপ্রেরণায় হয়েছিল। গানটা হলো, 'ওঠ গো ভারতলক্ষ্মী ওঠ আদি জগতজনপূজ্যা' কিংবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বাংলার মাটি বাংলার জল"। বিদগ্ধরা জবাব দেবেন কি?

জাতীয়তাবোধ না থাকলে একটি জাতি গড়ে ওঠে না। জাতীয়তাবোধ আর দেশপ্রেম আছে বলেই না আমরা বিদেশের সঙ্গে দেশের খেলার সময় আমাদের দেশকে সমর্থন করে হাসি কাঁদি আবেগের বশীভূত হই। জাতীয়তাবোধ আমাদের শেখায়— এটা আমাদের দেশের, এটা আমার জাতির। দুর্ভাগ্যের বিষয় আজ কিছু মানুষ, কিছু গণমাধ্যম আমাদের বোঝাচ্ছে জাতীয়তাবোধ আবার কী, দেশপ্রেমই বা কী? সম্প্রতি কলকাতার ফ্লাইওভার ভেঙে পড়ার ঘটনাটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেল জাতীয়তাবোধের অভাবের জন্যই এ ঘটনা ঘটল। জাতীয়তাবোধ নেই বলেই আমরা খাদ্যে ভেজাল মেশাই, নির্মীয়মাণ স্থাপত্যে ভেজাল মেশাই। সারা ভারতের মধ্যে দুর্ভাগ্যজনকভাবে পশ্চিমবঙ্গ এই ব্যাপারে এগিয়ে। সরকারি রিপোর্ট তাই বলছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বেশ কিছুদিন এই জাতীয়তাবোধ ছিল। স্কুল নির্মাণ, কলেজ নির্মাণ এলাকার মানুষের উন্নয়নের জন্য মানুষ নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তিও দান করেছেন। কিন্তু আজ কেন হচ্ছে না? এর কারণ বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় আধ্যাত্মিক দেশ এই ভারতবর্ষ। ধর্ম এবং ঈশ্বর এর পরতে পরতে। ঈশ্বর আর বিবেক সম্পৃক্ত। অর্থাৎ ঈশ্বর থাকলে বিবেক আছে আর বিবেক থাকলে ঈশ্বর আছেন। ধর্ম মানুষের মধ্যে পাপ পুণ্যের বোধ সৃষ্টি করে।

বর্তমানে এই বোধটাই আমাদের মধ্যে থেকে উঠে গেছে। অর্থাৎ বিবেক ব্যাপারটাই উঠে গেছে। আর এ জিনিস চলেই গেছে এই সব ময়ূরপুচ্ছ কাকেদের জন্যই। তারা বেড়ে ওঠেন এখানে অথচ ভোগবাদী বিদেশি মতবাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। ভোগের জন্য তারা নিজের বিবেকবোধটাও বেচে দেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাধারাণী' উপন্যাসে রাধারাণীর মা বলেছিল, "বাবা আমরা গরিব হইতে পারি কিন্তু চোর নই।" কিন্তু এই তথাকথিত মানুষগুলো নিজেদের ভোগের জন্য দেশটাকে বেচে দিতে পারে। এরা কি জানে ভরতরাজার নামাঙ্কিত এই ভারতবর্ষের গরিমা, যে দেশের ঋষিরা পর্ণকুটিরে বাস করতেন, গাছের ছায়ায় বসে বলেছিলেন, 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' কিংবা 'সর্বে সুখিনঃ ভবন্তু'র মতো কথা? ■

গরিবের ত্রাতা জগদীশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সাধারণ প্রবাদ বাক্য, ‘অর্থই অনর্থের মূল’। কিন্তু এই প্রবাদ বাক্যকে ভুল প্রতিপন্ন করেছেন জগদীশ লাল আহুজা। অর্থকে তিনি অর্থপূর্ণ পথে চালিত করেছেন। সত্তরোর্ধ্ব ছিন্নমূল এই ব্যক্তি তাঁর জীবনে প্রত্যক্ষ করেছেন চরম দারিদ্র্যকে। পেশোয়ারে জন্ম হলেও দেশভাগের যন্ত্রণাকে বুকে নিয়ে এপারে চলে আসা। বয়স তখন মাত্র ১২। জীবিকা নির্বাহের জন্য লজেন্স বেচা শুরু। এরপর অল্প কিছু টাকা নিয়ে পাড়ি জমান চণ্ডীগড়। সেখানে শুরু করেন ফলের ব্যবসা। ধীরে ধীরে পসার জমতে থাকে এবং এক সময় তিনি শহরের মধ্যে ‘ব্যানানা কিং’ বা কদলী সম্রাট নামে পরিচিত হন। এত পসার, অর্থ, খ্যাতির মধ্যে থেকেও ছোটোবেলার সেই দুর্ভিক্ষের দিনগুলিকে যেমন ভুলতে পারেননি, তেমনই মন থেকে মুছতে পারেননি না খেয়ে থাকার কষ্টকেও।

নিজ হাতে খাবার পরিবেশন করছেন সস্ত্রীক জগদীশ আহুজা।

সেই কারণে আজ তিনি গরিবের ক্ষুধা নিবারণে সচেষ্ট। কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি— সব দরিদ্র-নারায়ণ সেবায় উৎসর্গীকৃত। যখনই টাকার টান পড়েছে তখনই হাত পড়েছে সঞ্চিত সম্পত্তিতে। একে একে তিনি দুটি সম্পত্তি বেচে কোটি কোটি টাকা সংগ্রহ করেছেন সেবামূলক কাজের জন্য। পিজিআই এবং সেক্টর ৩২-এর সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সামনে শত শত গরিব রোগী যারা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসে এবং তাদের পরিজনদের জন্য লঙ্গর খুলেছেন। এ বছরের ২১ জানুয়ারি তাঁর লঙ্গরখানা ১৫ বছরে পড়লো। সারাজীবনের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ অকাতরে খরচ করছেন সেবাকাজে। প্রথম শ্রেণীর এক দৈনিকে প্রকাশ বর্তমান বছরের একদম শুরুতেই তিনি তাঁর সম্পত্তির কিছু অংশ ১.৬০ কোটি টাকায় বিক্রি করেছেন, কেবলমাত্র এই ক্ষুধা দূরীকরণ অভিযানের জন্য। প্রতিদিন ঠিক ঘড়ি ধরে প্রতিদিন দুপুর আড়াইটের সময় হাজির হন মেডিকেল কলেজে আর সন্ধ্যেবেলায় পিজি আই-এর দু’ নম্বর গেটের সামনে। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা— এই রোজনামচার কোনো পরিবর্তন নেই। তাঁর এস ইউ ভি হাসপাতালের গেটের সামনে দাঁড়ানো মাত্রই বুভুক্ষু মানুষগুলো হাসপাতালের পাঁচিল বরাবর সার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। এই মানুষগুলো যাতে পুষ্টিকর খাবার খেতে পায় তার প্রতিও তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। তাই প্রতিদিন তাদের জন্য বরাদ্দ থাকে চাপাটি, ডাল, হালুয়া, একটা কলা এবং এক প্যাকেট মিষ্টি অথবা বিস্কুট।

লঙ্গরখানা গত ১৫ বছর ধরে চালালেও তাঁর দরিদ্র নারায়ণ সেবা শুরু হয়েছিল ৩৫ বছর আগে। বড় ছেলের অষ্টম জন্মবার্ষিকীতে ঠিক করেছিলেন তাঁর দোকানের সামনে ঘুর ঘুর করা গরিব শিশুদের জন্মদিন উপলক্ষে কিছু খাওয়াবেন। সেই যে শুরু। কয়েকজন বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে শুরু হওয়া লঙ্গরখানায় আজ হাজার হাজার দরিদ্র নরনারীর ভিড়। সবার কাছে এটা ‘বাবার লঙ্গর’ নামে পরিচিত। শুধু খাবার নয়, শীতে কম্বল, সোয়েটার, জুতো, মোজাও বিলি করেন তিনি। হাতে খাবার পেয়ে গরিব মানুষদের চোখে-মুখে যখন হাসির ঝিলিক খেলে যায়, তখন এক অনাবিল আনন্দে মন ভরে ওঠে অশীতিপর আহুজার। আর তাঁর এই মানসিক প্রশান্তিই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে বছরের পর বছর ধরে এই সেবাধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

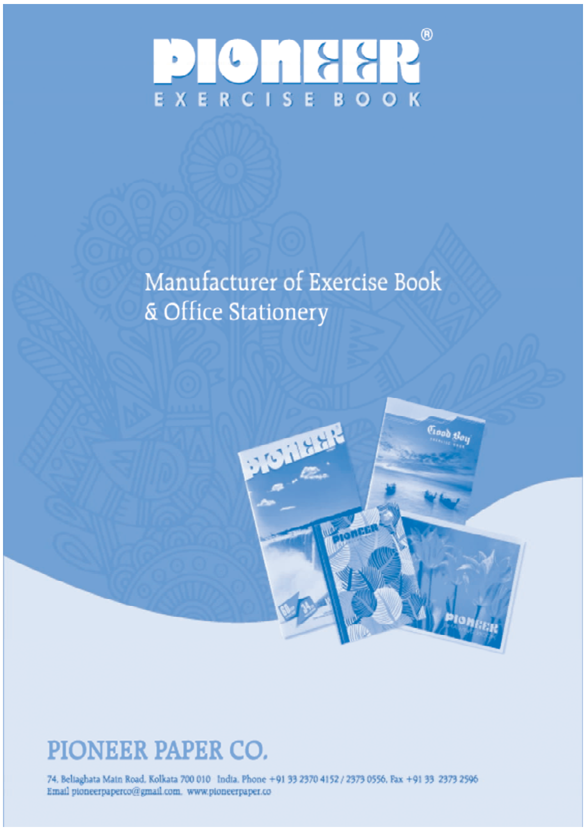

শিল্পের পুনর্জাগরণ অবশ্যই হতে হবে। কিন্তু তা কখনও যুরোপীয় শিল্পের দুঃখজনক ও হাস্যকর অনুকরণে নয় — যা আমরা বর্তমানে দেখছি। জনগণের কাছে দেশের বাণী পৌঁছে দিতে শিল্পের মতো এমন বাঙ্ময় আধার আর কিছু হতে পারে না। একখানি সংগীত, একটি চিত্র যেন পারাপারের তরণী— সকল জাতির কাছে পৌঁছে তাদের এক করে দেয়। (ভারতে) শিল্পের জাগরণ ঘটবেই, কারণ সে তার নূতন বিষয়বস্তু লাভ করেছে এবং 'ভারত' স্বয়ংই সেই বিষয়'

— *ভগিনী নিবেদিতা*

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

স্মৃতিবিভ্রমে হোমিওপ্যাথি

ডাঃ শ্রীদীপ রায়

স্মৃতিশক্তি যে-কোনো মানুষের নিত্যদিনের জীবনযাত্রায় খুবই জরুরি, বিষয়। স্মৃতিশক্তির অভাব শিশু থেকে বয়স্ক যে কোনো ব্যক্তির জীবনেই ছোটবড় সমস্যা আনে কিংবা আনতে পারে। স্মৃতিশক্তি আমাদের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেশিরভাগ মানুষের স্বাভাবিক নিয়মে বা বিভিন্ন কারণে (যেমন— অবসাদ, টেনশন, কোনো কোনো স্থায়ী দুঃখ, শারীরিক কিছু অসুখ প্রভৃতি) অদ্ভুত ধরনের বেশ কিছু ভুল হয়ে থাকে। বর্তমান সময়ে এমনটা ব্যাপকভাবে ঘটছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে বয়স্ক মানুষের এই অবস্থা অ্যালঝাইমার রোগ নামে পরিচিত। এক্ষেত্রে রোগী কোনো একদিন সকালে বাড়িতে যে আত্মীয় এসেছিলেন তার নাম বিকেলবেলায় আর মনে করতে পারছেন না। একইরকমভাবে সকালে কিছু খেয়ে বেমালুম ভুলে যাওয়া, রাস্তায় বেরিয়ে বাড়ির রাস্তা গুলিয়ে ফেলা-সহ একাধিক বিষয়ে স্মৃতিলোপ পেতে থাকে। ব্যবসা সংক্রান্ত হিসাব-নিকেশে যুক্ত থাকলে এই রোগের দরুন তাদের ভুলত্রুটি অনেক বেশি সংখ্যায় বাড়তে থাকে। এছাড়া অবসর জীবনে বহু বয়স্ক ব্যক্তি একাকিত্ববোধে ভুগতে থাকেন, যা অ্যালঝাইমার হওয়ার ক্ষেত্রে প্রবলভাবে দায়ী। পরিবারের সকলের সঙ্গে একসঙ্গে থাকলে এবং তাদের সঙ্গে দুবেলা প্রাণখুলে মেলামেশা করতে পারলে বার্ধক্যে এ ধরনের রোগের সম্ভাবনা কম থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই দুর্ঘটনা ঘটার পর মানসিক ও শারীরিকভাবে আঘাত পাওয়ায় অনেকের স্মৃতিশক্তি স্থায়ীভাবে লোপ পেতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রেই চিকিৎসার পর কিংবা ওষুধ ছাড়াই স্মৃতিশক্তি ফিরে আসে। অতিমাত্রায় মদ্যপানের জন্যেও অনেকের স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। মস্তিষ্কের মধ্যে উচ্চরক্তচাপের দরুন সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস রোগ হলে, সেক্ষেত্রে মাথার যে অংশ স্মৃতিশক্তি ধরে রাখে, তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে স্মৃতিশক্তি কমবেশি লোপ পেতে পারে। বয়স্ক মানুষ ও শিশুদের মধ্যে যাদের মস্তিষ্কের গঠনে জন্মগত ত্রুটি থাকে, তাদের ছাড়া ছাত্রছাত্রী ও যুবক-যুবতীদের স্মৃতিশক্তি বাড়াতে হোমিওপ্যাথি ওষুধ রয়েছে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা। স্মৃতিশক্তি লোপের বিভিন্ন লক্ষণ অনুযায়ী আর্সেনিক, অরামমেট, অ্যানকার্ডিয়াম, ব্যারাইটাকার্ব, লাইকোডিয়াম, প্লাটিনা, ভিরেট্রাম এল্বা, জিঙ্কগো বাইলো প্রভৃতি আরও হোমিওপ্যাথিক ওষুধ ব্যবহার হয়ে থাকে।

শিশু থেকে শুরু করে সব বয়সের মানুষদেরই স্বাভাবিকভাবে ভুলে যাওয়ার একটা অভ্যাস থাকে। জন্ম থেকেই অস্বাভাবিকভাবে স্মৃতিশক্তি কম কিংবা অসুস্থতার কারণে ধীরে ধীরে অনেকের স্মৃতিশক্তি হ্রাস পেতে থাকে। রোগ ছাড়াও বহু কারণে সাময়িকভাবে অনেকের স্মৃতিশক্তি দুর্বল হতে পারে। যেমন ভয়, উদ্বিগ্নতা থেকে দৈনন্দিন কাজে ভুল হতে পারে। ছাত্রছাত্রীরা নানা কারণে শেখা ও জানা বিষয়গুলি মনে রাখতে পারে না। শিক্ষাদানের ত্রুটিতে এটা ঘটতে পারে। এজন্য শিক্ষার্থীদের পড়ার বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা, পুনরায় চর্চা করা, একাগ্রতা এবং ধৈর্যসহকারে বারবার স্মরণ করা দরকার। এতে মস্তিষ্কে স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে বহুদিন নিখুঁতভাবে শেখা জ্ঞান ও তথ্য থেকে যায়, যেটিকে প্রয়োজনের সময় সঠিকভাবে স্মরণ করতে, লিখতে ও বলতে পারা সম্ভব। এ ধরনের স্মৃতিভ্রমের জন্য কেলিব্রোম, লাইকোপডিয়াম, নাক্সমস প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার হোমিওপ্যাথিক ওষুধ রয়েছে। আবার ছাত্রছাত্রীরা যাতে লেখাপড়ায় ও বড়রা কাজে মনোসংযোগ ভালোভাবে করতে পারে তার জন্য কনিয়াম, ইথুজা, জিঙ্কামমেট, স্ট্যাফিসাগ্রিয়া, ল্যাকেসিস প্রভৃতি ওষুধ বিশেষ ফলদায়ী। হঠাৎ দ্রুত কোনো কিছু মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে লিখে বা বলে না ফেললে, পরে সেটা সঠিক সময়ে অনেকেই আর মনে করতে পারে না। এরকম ক্ষেত্রে ইগ্নেশিয়া, কফিয়া প্রভৃতি ওষুধ উপকারী। ছাত্রছাত্রীরা বা বয়স্করা নার্ভাস হয়ে গিয়ে কোনোকিছু যখন মনে করতে পারেন না বা সমস্ত কিছু ভুলে যাচ্ছেন মনে হলে চিকিৎসকের পরামর্শমতো কেলিফস, নেট্রামকার্ব, জেলসিসিয়াম, নাক্সভম প্রভৃতি ওষুধ কার্যকরী। খুব গভীরভাবে অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর কোনো কিছু মনে আসার প্রবণতা দেখা গেলে কার্বোভেজ, অ্যাসিড ফস, ফসফরাস প্রভৃতি ওষুধ বিশেষ সুফল দিতে পারে।

বিভিন্ন বয়স, পরিবেশ, পারিবারিক শান্তিশৃঙ্খলা-সহ বহু বিষয়ের ওপর স্মৃতিভ্রমমূলক রোগের পরিণাম, স্থায়িত্ব ও আরোগ্য অনেকাংশে নির্ভর করে থাকে। সকল কাজে প্রতিদান হিসেবে কী পাচ্ছি, সেই হিসাব না করাই সঙ্গত। এতে ডায়াবেটিস, হার্টের রোগ শুধু নয়, যে কোনো শারীরিক ও মানসিক রোগ দূরে থাকে। দৈনন্দিন জীবনে মেডিটেশন, ব্যায়াম, খেলাধুলা ও সমাজসেবামূলক কাজের মাধ্যমে মানসিক শান্তি মিলতে পারে। ▮

ফঃ ৫

সমাবেশ সমাচার

মালদহে ঠাকুমা সম্মেলন

গত ১০ এপ্রিল মালদহ জেলার বাচামারী গভঃ কলোনিস্থিত বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরে ১৩৭ জন ঠাকুমার উপুস্থিতিতে ঠাকুমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চাঁচল কলেজের দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীমতী অনীতা চক্রবর্তী (গোস্বামী), রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্তা প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী মিনতি দত্ত মিশ্র। উপস্থিত ছিলেন বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদ দক্ষিণবঙ্গের প্রশিক্ষণ প্রমুখ প্রদ্যুৎ ঘোষ। প্রদীপ প্রজ্বলন এবং মাতৃবন্দনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অনীতা দেবী তাঁর বক্তব্যে বলেন, সব মায়েরা চায় তার সন্তান বৃদ্ধ বয়সে মাকে দেখাশোনা করুক। কিন্তু আজকাল ছেলেরা বহির্জগতে নিজেদের বিকিয়ে দিচ্ছে। তাদের চিন্তাভাবনায় থাকছে দাসত্ব। বৃদ্ধ মানুষের সেবা করলে চারটি গুণের বৃদ্ধি ঘটে থাকে। যথা আয়ু, বিদ্যা, যশ ও বল। মিনতি দেবী বলেন, প্রত্যেক মায়েরই তার নিজের আসন ছেড়ে দিতে কষ্ট হয়। পুত্রকে অন্যের হাতে অর্থাৎ বউমার হাতে ছেড়ে দিতে কষ্ট হয়। এ নিয়ে প্রত্যেক মায়ের মধ্যেই দ্বন্দ্ব থাকে। সংসার এক নিমেষে তাসের ঘরের ন্যায় ভেঙে যায়। কিন্তু গড়ার সময় তিল তিল করে গড়তে হয়। সমাজে সংসারের এই অশান্তি যেন এক বৃহৎ আকার নিয়েছে। আমাদের স্বার্থপরতার জীবন ত্যাগ করলে তবেই আমরা সংসারের শান্ত ছায়ায় সুখে জীবন কাটাতে পারব। প্রদ্যুৎ ঘোষ আজকের এই পরিস্থিতিতে ‘বিদ্যাভারতী’ যেভাবে কাজ করে চলেছে তার একটি নমুনা তুলে ধরেন। উপহার স্বরূপ ঠাকুমাদের হাতে একটি করে স্বামী বিবেকানন্দের পুস্তক তুলে দেওয়া হয়। ৩ জন ঠাকুমা তাদের অনুভব বর্ণনা করেন সকলের সামনে। শেষে শিশুমন্দিরের পরিচালন সমিতির সভাপতি অম্লান গাঙ্গুলী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শান্তি মন্ত্র পাঠ করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রবীণ নাগরিক সঙ্ঘের বর্ষবরণ

প্রবীণ নাগরিক সঙ্ঘ অফ বেঙ্গলের নববর্ষবরণ ১৪২৩ অনুষ্ঠান হয় গত শনিবার ১৬ এপ্রিল মানিকতলার নরেশ ভবনে। কবিগুরুর ‘এসো হে, বৈশাখ’ গানটি সমবেত কণ্ঠে পাওয়ার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। গানটি পরিবেশন করেন সংস্কার ভারতীর শিল্পী ভরত কুণ্ডু ও শীলা দে। উভয়েই প্রাক্তন ব্যাঙ্ক কর্মী এবং আমাদের সদস্য। সঙ্গীতানুষ্ঠানের সঙ্গে ছিল আলোচনা সভা। বিষয়— ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উপর আক্রমণ মেকলেপন্থীদের ষড়যন্ত্র। আলোচনার সূচনা করেন সংগঠনের সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র দে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র ও বিজ্ঞানী ড. জিষ্ণু বসু বহু তথ্য সহযোগে বলেন, ভারত ভূখণ্ড বারংবার আক্রান্ত হলেও ভারতবাসী কখনও তাঁর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করেনি। ড. বসুর বিশ্বাস ভারতীয় জাতীয়তার অস্তিত্ব কখনই লুপ্ত হবে না। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বহু ইতিহাস গ্রন্থকার কমলেন্দু ভট্টাচার্য ভারতীয় জাতীয়তাবাদের লড়াকু ইতিহাস বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এই প্রসঙ্গে শ্যামল হাতি কিছু সংযোজন করেন। বিশিষ্ট আইনজীবী দীপঙ্কর মুখার্জী ভারতের অখণ্ড জাতীয়তা রক্ষায় সংবিধানের যুগোপযোগী সংশোধনের উপর গুরুত্ব দেন। জোরালো ভাষণ দেন প্রাক্তন প্রতিরক্ষা কর্মী বিজয় কুমার। দুই প্রবীণ-প্রবীণা সদস্য সুকুমার সেন ও দীপা হাতি উদাত্ত কণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সমাপ্তি ভাষণ দেন প্রবীণ প্রচারক অমরকৃষ্ণ ভদ্র। সভার সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় কর সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পরলোকে অচলা নন্দী

গত ২ এপ্রিল দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত বৌদ্ধিক প্রমুখ শ্রীকান্ত নন্দীর মাতৃদেবী অচলা নন্দী বর্ধমান জেলার পাঁচলা গ্রামে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি বর্তমানে ৪ পুত্র, তিন পুত্রবধূ, ২ কন্যা, নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। শ্রীকান্ত নন্দী বেশ কয়েকবছর সঙ্ঘের প্রচারক হিসাবে কাজ করেছেন। মা অসুস্থ হওয়ার পর মায়ের দেখাশোনার জন্য তিনি বাড়িতে রয়েছেন। উল্লেখ্য, শ্রীনন্দী প্রচারক বেরোনোর দিন মা অন্য সকলের সঙ্গে তাঁকে বেশ কিছুটা রাস্তা এগিয়ে দিয়েছিলেন। পুত্রের প্রচারক থাকার কথা মা গর্বভরে উল্লেখ করতেন।

মালদা সংস্কার ভারতীর বর্ষপ্রতিপদ উৎসব

মালদা সংস্কার ভারতী শাখার উদ্যোগে বর্ষপ্রতিপদ ও বাংলা বর্ষবরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় গত ১২ এপ্রিল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্থানীয় ক্ষুদিরাম সাউ শপিং কমপ্লেক্সের দোতলায় পণ্ডিত বিষ্ণুসেবক মিশ্র সঙ্গীত ভবনে।

মন্ত্রের মন্দ্রিত ধ্বনির আবহে দীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক রাধাগোবিন্দ পোদ্দার। নটরাজ, ভারতমাতা ও ডাক্তারজীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন উপস্থিত সকলে। তারপরেই সংস্থার সভ্য-সভ্যাবৃন্দের সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হয় 'সাধয়তি সংস্কার ভারতী ভারতে নবজীবনম্' ভাব সঙ্গীত।

বাংলা চলচ্চিত্র ও ধারাবাহিকের প্রখ্যাত অভিনেতা সুমন বন্দোপাধ্যায়ের উপস্থিতি অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্যকে বর্ধিত করে। শিল্পীকে বরণ করেন সংস্কার ভারতীর উত্তরবঙ্গ প্রান্তের নির্দেশক চন্দন সেনগুপ্ত। উত্তরীয় প্রদান করেন প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক তড়িৎ মিশ্র, মানপত্র প্রদান করেন প্রান্তের সহ-সভাপতি সঞ্জয় নন্দী। ক্ষুদ্র উপহার তুলে দেন সঙ্গীতজ্ঞ চলচ্চিত্র প্রযোজক সুশীল সাউ। ডাক্তারজীর স্মরণে ভাবগম্ভীর সঙ্গীত পরিবেশন করেন সজল দত্ত। সঙ্গীত ও গীতি-নৃত্য আলেখ্য পরিবেশন করেন শ্রীমতী সুমিতা ভট্টাচার্য, শ্রীমতী লক্ষ্মী সরকার, দিপীকা মৈত্র, রীমা কর্মকার, শ্রাবণী ঘোষ, মধুমিতা চক্রবর্তী, শুক্লা রায় ও তন্দ্রা পাল। নৃত্য পরিবেশন করেন শ্রীমতী সোমা ভট্টাচার্য ও শ্রীজা পাল। তাপস চক্রবর্তীর গিটার বাদন শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। তবলা সঙ্গতে ছিলেন জয় রায়চৌধুরী ও নিতাই হালদার। ভাষ্যপাঠ করেন সুভাষ চক্রবর্তী।

শুভঙ্কর দাসের গন্থনায় রবি ঠাকুরের ষড়ঋতুর অনুভবে 'ঋতুরঙ্গশালা' গীতি-নৃত্য-আলেখ্যটি অবশ্যই অনন্যতা দাবি করে। শাখার সকল সত্য ও সভ্যা শিল্পীর দ্বারা উপস্থাপিত 'ঋতুরঙ্গশালা' অনুষ্ঠানের ও সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন দূরদর্শন ও আকাশবাণীর প্রখ্যাত প্রবীণ সঙ্গীতশিল্পী জগন্নাথ দে। অনুষ্ঠানের সঞ্চালিকা ছিলেন সংস্কার ভারতী মালদা শাখার সম্পাদিকা শ্রীমতী তন্দ্রা পাল।

ক্রীড়া ভারতীর বার্ষিক বৈঠক

গত ২৫ থেকে ২৭ মার্চ সোনারপুরে সুভাসগ্রামের অবকাশ ভবনে ক্রীড়া ভারতীর বার্ষিক বৈঠক সম্পন্ন হয়। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ৫৬ জন কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন। তার মধ্যে ১২ জন মহিলা। অখিল ভারতীয় সংগঠন মন্ত্রী সঞ্জয় তিওয়ারী এবং বিহার ও ঝাড়খণ্ডের কার্যকর্ত্রী শ্রীমতী শকুন্তলা মিশ্র উপস্থিত ছিলেন। 'সুস্থ ভারত এবং সমর্থ ভারত গঠন' লক্ষ্য নিয়ে বৈঠক শুরু হয়। বৈঠকের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট যোগবিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসক ড. অরুণ মুখার্জী। অবকাশ ভবনে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে খুব উৎসাহের সঙ্গে বৈঠক, কবাডি খো খো খেলার প্রশিক্ষণ এবং যোগ প্রশিক্ষণ হয়। বৈঠকের শেষে সরকারি দৃষ্টিতে বাংলা প্রদেশের এবং দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের কার্যকর্তাদের দায়িত্ব ঘোষণা হয়।

বাংলা প্রদেশ কার্যকাররিণী সভাপতি— তপন মোহন চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি— ক্যাপ্টেন ভগীরথ সামুই, সম্পাদক— তপন গাঙ্গুলী, সহ-সম্পাদক— বিভাস মজুমদার, কোষাধ্যক্ষ— অমরেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়।

দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যকারিণী সভাপতি--- তপন মোহন চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি—কাজলবরণ সিংহ, সম্পাদক—বিভাস মজুমদার, সহ-সম্পাদক—দীপাঞ্জন গুহ, রণজয় দাস, সদস্য—প্রশান্ত মাহাতো, পার্থ বিশ্বাস, জীবন ময়রা, গোষ্ঠবিহারী ঘোষ, সুশোভন মুখার্জী, অজয় ডাগা, সদস্যা— শ্রীমতী সবিতা প্রসাদ, শ্রীমতী জয়ন্তী মণ্ডল।

ভবানীপুরে রক্তদান শিবির

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ২৮ মার্চ কলকাতার দক্ষিণভাগের ভবানীপুর সঙ্ঘ কার্যালয়ে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন ওমপ্রকাশ রাওয়াত। উপস্থিত ছিলেন ব্যবস্থা প্রমুখ উমেশভাই রূপানি, ভাগ কার্যবাহ তথা কলকাতা মহানগর সেবা প্রমুখ রাজীব শরণ, সুশীল বাগাড়িয়া, সঞ্জীব শর্মা, জীবন সেন প্রমুখ। মোট ৬৫ জন রক্তদান করেন।

সোনারপুরে বসন্ত বরণ অনুষ্ঠান

গত ২৪ মার্চ দোল পূর্ণিমার সন্ধ্যায় সংস্কার ভারতী সোনারপুর শাখা, রাজপুর বাদামতলা দুর্গোৎসব কমিটি ও ব্লু-স্কাই থিয়েটার, রাজপুরের উদ্যোগে একটি মনোগ্রাহী 'বসন্ত বরণ' অনুষ্ঠান হয় রাজপুরের উৎপল দত্ত মঞ্চ প্রাঙ্গণে। নৃত্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সুচনা হয়। ব্লু-স্কাই থিয়েটারের অন্যতম সদস্য স্বপন মৈত্র বসন্ত বরণ উৎসবের সঙ্গে প্রচলিত হোলি উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। বিভিন্ন শিল্পী নৃত্য-গীত-আবৃত্তির মাধ্যমে বসন্তকে আহ্বান জানান। এরপর দুর্গোৎসব কমিটি ও সংস্কার ভারতীর সোনারপুর শাখার শিল্পীরা পরিবেশন করেন অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ অমিতাভ মুখোপাধ্যায় রচিত সঙ্গীতালেখ্য 'বসন্ত ওই এলো দ্বারে'। এই শ্রুতিমধুর অনুষ্ঠানটির সঙ্গীত পরিচালনা করেন রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। শেষ অনুষ্ঠান ছিল তানিয়া দাসের পরিচালনায় নৃত্যালেখ্য 'আনন্দ বসন্ত সমাগমে'। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংস্কার ভারতীর সোনারপুর শাখার সম্পাদক অমিতাভ মুখোপাধ্যায়।

আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী প্রয়াণতিথি উদ্‌যাপন

প্রখ্যাত সাহিত্যিক, জনপ্রিয় রাজনীতিক তথা উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন রাজ্যপাল প্রয়াত বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীর ১১তম প্রয়াণতিথি উদ্‌যাপন গত ১৭ এপ্রিল কলকাতায় শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী। বিভিন্ন বক্তা শাস্ত্রীজীর জীবনের বহু প্রেরণাদায়ী প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। ওমপ্রকাশ মিশ্র শাস্ত্রীজীর লেখা বিভিন্ন গান পরিবেশন করে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠীনে শাস্ত্রীজীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন ড. বসুমতি দাগা, ড. তারা দুগড়, ড. অর্চনা পাণ্ডে, ড. সত্যপ্রকাশ তেওয়ারী, শ্রীরাম তেওয়ারী, মহাবারী বজাজ, ভঁওরলাল মুন্ধ্রা, রাধেশ্যাম সোনী, অরুণ প্রকাশ মল্লবত, নন্দকুমার লঢ়া, তারক দত্ত সিংহ, রবিপ্রতাপ সিংহ প্রমুখ।

শোকসংবাদ

মালদহ জেলার গোলাপগঞ্জ খণ্ডের নলদহরি শাখার স্বয়ংসেবক মাধব মণ্ডল গত ২৪ মার্চ এক পথ দুর্ঘটনায় পরলোকগমন করে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র ২২ বছর। তিনি প্রথমবর্ষ শিক্ষিত স্বয়ংসেবক ও শাখার মুখ্যশিক্ষক ছিল। তার বাবা লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল প্রথমবর্ষ শিক্ষিত স্বয়ংসেবক, বর্তমানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দায়িত্ব প্রাপ্ত কার্যকর্তা। মাধবের অকাল মৃত্যুতে গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে।

* * *

বীরভূম জেলার প্রবীণ স্বয়ংসেবক ধ্বজাধারী দত্ত গত ১ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি শিশুমন্দির প্রতিষ্ঠাসহ বহু জনহিতকর কাজের গোড়াপত্তন করেন। তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র, পুত্রবধূ ও ১ নাতি রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বর্ধমান জেলা বৌদ্ধিক প্রমুখ সুব্রত সামন্তের মাতৃদেবী অভয়া সামন্ত গত ১৮ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি ৪ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তাঁর তিন পুত্র স্বয়ংসেবক।

খো খো-তেও উঠে আসছে ভারত

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৯০-এর বেজিং এশিয়াডে প্রথম কবাডি অন্তর্ভুক্ত হয়। তারপর থেকে প্রতিটি এশিয়াডেই কবাডিকে গুরুত্বপূর্ণ খেলা হিসেবে দেখা গেছে। আর তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ভারতকে বিজয়মঞ্চের সবচেয়ে উঁচু ধাপে উঠে দাঁড়াতে দেখা যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে। অনেকটা হকির মতো। একদা অলিম্পিকে যেমন পরপর চ্যাম্পিয়ন হয়ে একাধিপত্যের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল ভারতীয়রা এখন তেমনি সেটা কবাডিতে হয়ে দাঁড়িয়েছে এশিয়াডের আসরে। এবার আর এক ভারতীয় খেলাও আন্তর্জাতিক মঞ্চে স্বীকৃতি পাওয়ার অপেক্ষায়। খো খো যা গ্রাম বাংলা-সহ ভারতের প্রতিটি গ্রামে নিয়মিত চর্চা হয়। সম্প্রতি গুয়াহাটির সাফ গেমসে ভারতের মহিলা খো-খো দল প্রথম আত্মপ্রকাশেই এক নতুন অধ্যায় রচনা করে ফেলল। সাফ গেমসের সাফল্য দেখে উৎসাহিত হয়ে ভারতের খো খো ফেডারেশন এবার আরও বৃহত্তর মঞ্চ অর্থাৎ এশিয়ান গেমসে খো-খো-র অন্তর্ভুক্তির জন্য জোরালো দাবি পেশ করবে অলিম্পিক কাউন্সিল অব এশিয়ার দরবারে। সাফ গেমসে খেলা কয়েকজন মহিলা খেলোয়াড়ের সোনা জয়ের পর প্রতিক্রিয়ায় কী বলেছেন তা নিয়েই এই নিবন্ধ।

দিল্লীর পারভিন লিসা গেমসে ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়িকা ছিলেন। দিল্লীর যে অঞ্চলে লিসার বাস তার আশেপাশে খো-খো খেলাটির নাম কজন শুনেছেন তা নিয়েও ঘোরতর সংশয় রয়েছে। মূলত দারিদ্র্য, অভাব-অনটন যেখানে নিত্যসঙ্গী, সেরকম একটি অঞ্চল থেকে লিসা উঠে এসে দেশকে সাফ গেমসের সর্বোচ্চ মঞ্চে তুলে ধরেছেন তা যেন পড়শীদের এখনো বিশ্বাস হয় না। যাবতীয় সমস্যা, প্রতিকূলতা অতিক্রম করে লিসা তার অভিষ্ট স্বপ্নপূরণের দিকে এগিয়ে চলেছেন। স্বপ্ন অলিম্পিকে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করা। লিসার বিশ্বাস অলিম্পিক ইভেন্ট হিসেবে খো-খো একদিন নিখাদ ভারতীয় খেলার জয়গান রচনা করবে। শক্তি, সাহস, চ্যালেঞ্জ-সর্বস্ব এই খেলা যে দেশাত্মবোধকেই নতুন করে চিনিয়ে দেয়। তার দুই দিদি রাজ্যস্তরে খো-খো খেলতেন। তাঁরাই তার অনুপ্রেরণার উৎস। এছাড়া লিসা কৃতজ্ঞ তার কোচ কাম মেন্টর সুমিত ভাটিয়ার প্রতি। পাড়ার মাঠে খেলতে দেখে সুমিত বর সুপ্ত প্রতিভা চিনে নিয়েছিলেন এবং নিজের ক্লাবে নিয়ে আসেন। উন্নত প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়ে লিসা অচিরেই পরিশীলিত হয়ে ওঠেন এবং জাতীয় নির্বাচকদের নজরে পড়ে যান। তার পরের ঘটনা তো ইতিহাস। ভারতীয় দলে ঢোকা এবং পরের পর প্রতিপক্ষকে হারিয়ে সাফে সোনা জয়।

এই বাংলার হুগলী জেলার দীপিকা চৌধুরিও উঠে এসেছেন দুঃখ-কষ্ট এবং বঞ্চনার আবহ থেকে। যা তাকে আরো শানিত এবং কষ্টিপাথরে ঘষে মেজে আগুনের মতো তেজিয়ান করে তুলেছে। সাফ গেমসে কোর্ট জুড়ে তাই দীপিকাকে বাঘিনীর মতো দাপটে ছুটে বেড়াতে দেখা গেছে। বাবা শ্রমিক, মা পরের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করেন। ছোট ভাইকে খেলতে দেখে উৎসাহিত হয়ে চলে আসেন পাড়ার খো-খো ক্লাবে। হুগলী জেলার খো-খো-র পরিবেশ এবং পরিকাঠামো তাকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। তা বলে বাবা রঞ্জন চৌধুরী স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি যে মেয়ে একদিন দেশের জার্সি গায়ে চাপিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার মঞ্চ দাপিয়ে বেড়াবে এবং দেশকে সোনা জিততে এক বড় ভূমিকা পালন করবে। মেয়ের নাম, যশের দৌলতে পাড়াতে রীতিমতো সম্মানজনক অবস্থান পিতা-মাতার। এখন দীপিকার লক্ষ্য এশিয়ান গেমস এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানে উঁচু পদে চাকরি, যাতে বাবা-মাকে আর হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে না হয়। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসংস্থা তার সঙ্গে কথা বলেছে। দীপিকা আশাবাদী এর মধ্যে কোনো এক জায়গায় মনের মতো কাজ পেয়ে যাবেন।

ছত্তিশগড়ের ভিলাই শিল্পাঞ্চল থেকে উঠে এসেছেন যশোদা সাহু। বাবা ঘনশ্যাম সাহু স্টিল প্ল্যান্টে ক্রেন অপারেটর। ক্লাস ফাইভে পড়ার সময়ই খো-খো-র প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন যশোদা। স্টিল প্ল্যান্টের কমপ্লেক্সে সব ধরনের ক্রীড়াচর্চার সুবন্দোবস্ত থাকলেও খো-খো ছাড়া অন্য কোনো খেলা বিশেষ একটা টানত না যশোদাকে। আর ভাল কোর্ট, কোচিং এবং বড় বড় টুর্নামেন্ট খেলার সুযোগ সুবিধে পেয়ে যশোদাকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। মহারাষ্ট্রের শোলাপুরে জাতীয় প্রতিযোগিতায় ভাল পারফরমেন্সই তাকে ভারতীয় দলে নির্বাচিত করে। সাফ গেমসে প্রতিটা ম্যাচে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে খেলেছেন যশোদা। তারও স্বপ্ন আরও বৃহৎ আন্তর্জাতিক পরিসরে নিজেকে তুলে ধরা এবং দেশকে গৌরবান্বিত করা।

লিসা, যশোদা, দীপিকার মতো ভারতীয় দলের প্রতিটি মেয়েই প্রথমবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে নেমে দেশকে বিজয় গৌরব এনে দিতে পারায় যতটা না রোমাঞ্চিত, তার থেকে অনেক বেশি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আরো বড় সাফল্যমণ্ডিত পথ পরিক্রমা করে বিশ্ব খো-খো সার্কিটে চিরস্থায়ী উজ্জ্বল এক বৃত্ত রচনা করার জন্য। যেভাবে খো-খো-র জনপ্রিয়তা বাড়ছে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে, তাতে খেলাটি ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছেও গ্রহণযোগ্য হবে বলে তাদের ধারণা। আর তাহলেই এক বিশ্বজনীন জনপ্রিয় খেলা হিসেবে উঠে আসবে খো-খো।■

শব্দরূপ-৭৮৪ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

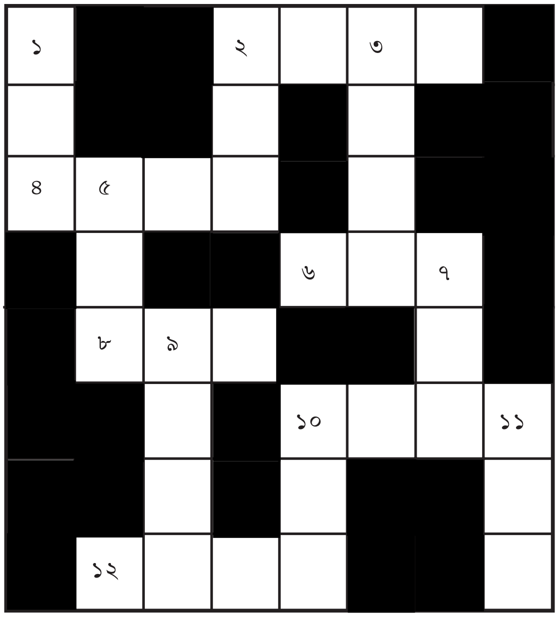

সূত্র :

পাশাপাশি : **২.** মহাদেব; বিখ্যাত বাংলা রামায়ণ রচয়িতা, **৪.** দাঁতের উপরে যে দাঁত বের হয়; উঁচু দাঁত, **৬.** উচ্চ ('—তরঙ্গ'), **৮.** ছল, ভণ্ড, প্রতারক, **১০.** যে রাত্রিকালে বিচরণ করে, **১২.** বিখ্যাত কবিবিশেষ; বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের এক।

উপর-নীচ : **১.** নাগকেশর জাতীয় বৃক্ষবিশেষ, **২.** যম, **৩.** যে কন্যা সম্প্রদান করার জন্য পাত্রপক্ষীয় কোনো লোককে কথা বা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, **৫.** সীতার পিতা, সকলের পিতা, **৭.** মাদার ফল, **৯.** যোগসূত্র ও পাণিণিভাষ্য রচয়িতা ঋষি, **১০.** ফুলের বা ফলের নিষ্কাষিত রস, **১১.** মাঘ মাসের কৃষ্ণ-চতুর্দশী।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৮১
সঠিক উত্তরদাতা

তুহিন আটা
বাঁকুড়া
সুশীল কয়াল
কলকাতা-৬

■	■	গ	র্ভ	দা	স	■	গ
অ	প	য়া	■	■	গ	■	রু
■	র	■	গো	■	র	গ	ড়
■	শ	ক্র	ঘ্ন	■	■	জ	■
■	ম	■	■	ত্রা	ট	ক	■
গ	নি	কা	■	স	■	চ্ছ	■
ভী	■	ছি	■	■	পা	প	ঘ্ন
রা	■	ম	ন্দা	ক্রা	ন্তা	■	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

▯ ৭৮৪ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৬ মে ২০১৬ সংখ্যায়

প্রেরণার পাথেয়

আজ যে সমাজবাদের চর্চা চারিদিকে হচ্ছে তা সমাজের পক্ষে কল্যাণকারী বলে দাবি করা হচ্ছে। বস্তু উৎপাদন ও বিতরণের সমস্ত ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রের অধিকার কায়েম করা সমাজবাদের উদ্দেশ্য। জনতা শ্রমিকের মতো কাজ করতে বাধ্য হবে। কারও নিজস্ব অধিকার বলে কিছু থাকবে না। এইরকম সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রেণী সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামকে আহ্বান করা হচ্ছে। এই সমাজবাদ শান্তির মোড়কে আনারও প্রচেষ্টা হচ্ছে। ব্যক্তি ও সমাজের হিতের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য মনে করে। ব্যক্তি স্বাধীনতা সীমিত করার এই পদ্ধতিতে মানুষকে যন্ত্রের এক একটি অংশরূপে থাকতে হয়। এই রকম সমাজবাদে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক ভারতীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরার সঙ্গে খাপ খায় না। আমরা এরকম সমাজবাদী নই, আবার পশ্চিমী ভাবধারার মতো ব্যক্তিবাদীও নই। আমাদের উপনিষদে বলেছে, যে শুধু ব্যক্তির উপাসনা করে সে অন্ধকারে থাকে এবং যে শুধু সমষ্টির উপাসনা করে সেও অন্ধকারে থাকে। ভারতীয় পদ্ধতিতে দুইয়ের সমন্বয় চাই। ব্যক্তিবাদের উপাসনা করে মৃত্যুকে জয় করা চাই এবং সমষ্টির উপাসনা করে অমরত্ব প্রাপ্ত করা চাই। ব্যষ্টিকে সমষ্টিতে বিলীন করার জন্য আমরা সদা সচেষ্ট। ব্যষ্টি মরণশীল কিন্তু সমষ্টি অমর।

যদি ব্যক্তিকে স্বাধীন হতে হয় তবে সমাজও স্বাধীন হওয়া চাই। যদি ব্যক্তিকে অমর হতে হয় তবে সমাজকে অমর হতে হবে। সমাজের জন্য ব্যক্তির সমর্পণ জরুরি। সেই সঙ্গে ব্যক্তির সামর্থ্য ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য স্বাধীনতা দেওয়ার কাজ সমাজের। এইরকম ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্বন্ধ আমরা স্বীকার করেছি। এইভাবেই আমরা সমাজবাদী নই, সমন্বয়বাদী।

(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যক্তি-দর্শন থেকে)

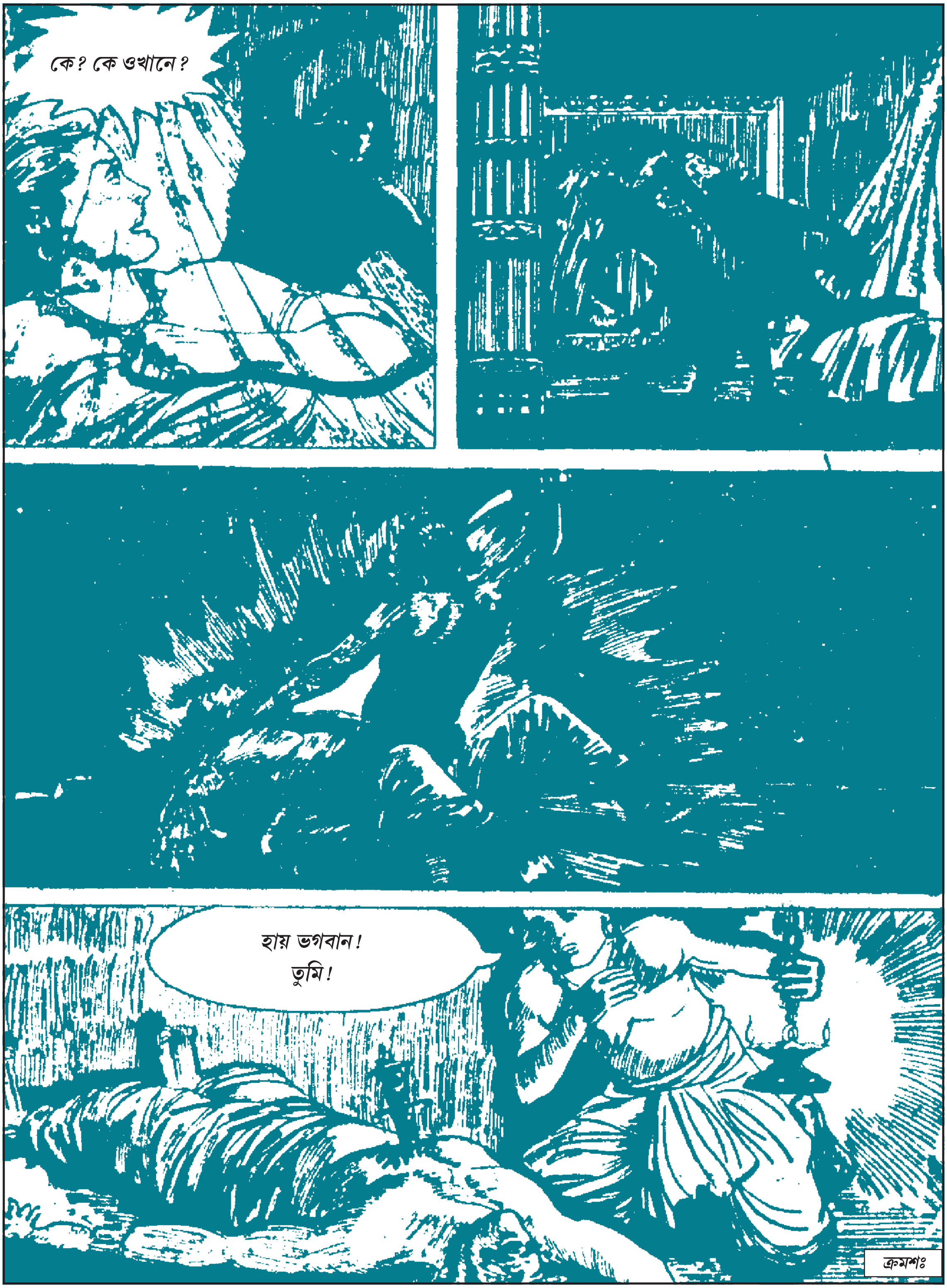
কে? কে ওখানে?
হায় ভগবান!
তুমি!
ক্রমশঃ

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ২০১৫-১৬-তে চীনের থেকে ভারত এগিয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ অর্থনৈতিক উন্নতি-অবনতির নির্ধারণে তার সূচকগুলির মধ্যে বিগত কয়েক দশকে নানান পরিবর্তন, পরিমার্জন ঘটে গেছে। তাই আজকাল চিরাচরিত মাথা পিছু আয় ধরে কোনো একটি দেশের অর্থনৈতিক শক্তি সব সময় নির্ধারিত হয় না। এই মানদণ্ডে সর্বশেষ সংযোজন হয়েছে একটি দেশের জ্বালানি খরচ ও পরিমাণ। তা সে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেই হোক কিংবা গৃহস্থালির ব্যবহারে বা উভয়ে মিলিয়েও হতে পারে। এই পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে সর্বশেষ যে তথ্য উঠে এসেছে তাতে ভারত ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে জ্বালানি খাতে চীনের থেকে ১১ শতাংশ বেশি পরিমাণ জ্বালানি ব্যবহার করেছে। এটি টাকার হিসেবে নয়, কেননা আন্তর্জাতিক মূল্যমানে তার ওঠাপড়ায় অনেক সময় ফারাক পড়তে পারে। এটি কেবলমাত্র খরচের পরিমাণগত (Quantitative) হিসেব। সরকারি মত অনুযায়ী দেশে যাত্রী ও ব্যবসায়িক গাড়ি বিক্রির পরিমাণে নজরে পড়ার মতো বৃদ্ধি ও উৎপাদন ক্ষেত্রে নিশ্চিত ঘুরে দাঁড়ানোর স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

২০১৪-১৫ সালে ১৬৫ মিলিয়ন টনের জ্বালানি ব্যবহার ২০১৫-১৬ সালের অর্থবর্ষে বৃদ্ধি পেয়ে ঘটেছে ১৮৩ মিলিয়ন টন। এই তথ্যটি Petroleum Planning & Analysys Cill যাঁরা এ বিষয়ে সর্বদা অর্থনীতির বাজার বিশ্লেষণ করেন তাঁদের হিসেব অনুযায়ী উঠে এসেছে। সংবাদসূত্রে প্রকাশ, বিগত দশ বছরের মধ্যে এই বৃদ্ধি সর্বোচ্চ। ২০১৫-১৬-র আলোচ্য বর্ষে চীনের যানবাহন ক্ষেত্রে জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধির পরিমাণ ৭.২ শতাংশ মাত্র।

প্রসঙ্গত, দেশের ডিজেল ব্যবহার ৭.৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭৪.৬ মিলিয়ন টনে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে পেট্রলের ব্যবহার ১৪.৫ শতাংশ বেড়ে ২১.৮ মিলিয়ন টনে গিয়ে পৌঁছেছে। এর মূল কারণ হিসেবে বিগত ৫ বছরে দ্রুততম গতিতে অটোমোবাইল বিক্রির বৃদ্ধিকেই দায়ী করা হচ্ছে। এই সূত্রে Society of Indian Automoblile Manufacturers-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী গাড়ি বিক্রির সংখ্যা ২০১৪ অর্থবর্ষে যেখানে ২.৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল সেই সংখ্যা ২০১৫ অর্থবর্ষে একলাফে ৯.৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

গত ১২ এপ্রিলের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী দেশে শিল্প উন্নয়নের সূচক ফেব্রুয়ারি মাসে ২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধি আগের তিন মাসের বৃদ্ধি ক্ষেত্রে সংকোচনের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। উল্লেখযোগ্যভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্র ও খনিজ উত্তোলন ক্ষেত্রের বৃদ্ধির সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যপণ্য উৎপাদনেও বিপুল বৃদ্ধি পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের রাস্তা নির্মাণ ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার কারণে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল 'বিটুমেন' ব্যবহারে ২০১৫-১৬ এক ধাক্কায় ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটেছে।

এই বিটুমেন ব্যবহারে রাস্তা নির্মাণ আরও গতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভাবনীয় বৃদ্ধি ঘটবে বলে বিশেষজ্ঞদের অনুমান। অর্থনৈতিক উন্নয়ন যে ক্রমশ গতি সঞ্চার করছে তার আর একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেছে রান্নার গ্যাস ব্যবহারে ৮.৬ শতাংশ চাহিদার বৃদ্ধিতে। লক্ষণীয়, সরকার দেশব্যাপী অস্বাস্থ্যকর জ্বালানির পরিবর্তে ভরতুকিপ্রাপ্ত গ্যাসকে গরিব মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার যে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়েছে এই বৃদ্ধি তারই প্রত্যক্ষ প্রতিফলন বলে শোনা যাচ্ছে।

ভোট বয়কট বীরভূমের তিনটি গ্রামে

সংবাদদাতা ॥ বীরভূম জেলার প্রান্তিক অঞ্চল রাজনগর থানার গাংমুড়ি-জয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনটি গ্রামের মানুষ একযোগে তাঁদের পূর্ব নির্ধারিত ঘোষণা অনুযায়ী বয়কট করলেন বিধানসভার ভোট। কুড়ুলমেটিয়া, গুয়াবাগান ও পটলপুর— সিদ্ধেশ্বরী নদীর ওপারে ঝাড়খণ্ডের গা ঘেঁষা এই তিনটি গ্রামের প্রায় সাতশো ভোটার সপ্তাহ তিনেক আগেই চারটি দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন। তাঁদের মূল দাবি— সিদ্ধেশ্বরী নদীর ওপর পারাপারের সেতু চাই। বর্ষা এলেই এই তিনটি গ্রাম নদীর এপারের জনপদ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বন্ধ হয়ে যায় ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়া। ভেসে যায় মানুষ থেকে বহু গবাদি পশু। অসুস্থ রোগী আটকে থাকে নদীর ওপারেই। বীরভূম সাংসদ শতাব্দী রায় ভোটে জিতলে এখানে নদীর ওপর সেতু তৈরি করে দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন বলে গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন। অন্যদিকে, এরকম কোনো কথা দেওয়া হয়নি বলে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি। এছাড়াও পানীয় জল, রাস্তা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দাবিও করেছেন গ্রামবাসীরা। ১৭ এপ্রিল ভোটের দিন রাজনগর ব্লকের বি-ডি-ও দীনেশ মিশ্র দু-বার ঘটনাস্থলে গিয়ে গ্রামবাসীদের ভোট দেবার আবেদন জানান। কিন্তু তাতে চিঁড়ে ভেজেনি। সিউড়ি-২৮৫ (সাধারণ) বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত রাজনগর ব্লকের এই দু-নম্বর বুথের একজন ভোটারও এদিন বুথমুখো হননি। তবে নেতা-নেত্রীরা কথা না রাখলেও এলাকার ব্রজরাজ ঘোষ, বাপী ঘোষ, লাখপতি ঘোষ, অতিজুল হেমরমরা এই আয়ারাম-গয়ারামের বাজারেও একজোট হয়ে নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল রইলেন।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
25 April - 2016 - Rs. 10.00